

সংবাদ প্রতিদিন
৩১ জানুয়ারি ২০১০

রোববার

বইচোর

সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে


দেবজ্যোতি
ধুলোখেলা
অতীতের সাগর সেঁচা মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

প্রতিদিন

রোববার

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

প্রচ্ছদ : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা বসু, প্রসূন চক্রবর্তী,
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী, বিপুল গুহ, ভাস্কর লেট, রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার, শান্তনু দে, সন্তোষ দত্ত, সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।





অনেকদিন লাগল ব্যাপারটা থিতু হতে মনের মধ্যে। মানুষটা সত্যিই আর নেই।

এতদিন টেলিভিশনের নানা চ্যানেল-এর মুহুর্মুহু আরোগ্য বুলেটিন, সংকটের পরিমাপ নিয়ে ঘন ঘন শঙ্কা স্বস্তির দোলাচল! একবার মনে হচ্ছে আরোগ্যপ্রার্থনাও কি এখন এই রোগাতুর ছিয়ানব্বই বর্ষীয়র জন্য বেদনার? কোনও পিছু-ডাকাই কি এবার কেবল যন্ত্রণার পিছুটান?

ঠিক বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে যেমন উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা নিয়ে কালযাপন করি আমরা, জানুয়ারি মাসের প্রথম সতেরোটা দিন তেমনই কেটেছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর—পার্টি, ধর্ম নির্বিশেষে।

আমরা, যারা বড় হয়েছি লোডশেডিংকে 'জ্যোতিবাবু' বলে ঠাট্টা করে, নানা সময় ওঁর কেবল সর্বনামভিত্তিক বক্তৃতা নিয়ে কৌতুকবোধও করেছি সময় সময়—আমরা সবাই যেন কোথাও অজানিতভাবেও জানতাম যে আমাদের একজন সার্বজনীন অভিভাবক আছেন, তাঁর নাম জ্যোতি বসু।

সেদিন বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে একটা বড় হোর্ডিং চোখে পড়ল Long live Jyati Basu। এতদিনের এত সংবাদপত্রে কলাম সেন্টিমিটারের কাড়াকাড়ি, টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর ধাক্কাধাক্কির মধ্যে যে সারসত্যটা কোথাও যেন প্রবেশ করছিল না মনের ভেতর, বা মনই বুঝি বাধা দিচ্ছিল কোনও চূড়ান্ত অশুভর ইঙ্গিত, সকালবেলার নির্মল রোদে কলকাতা শহরের গাড়িঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে ওই একটা হোর্ডিং যেন কেমনভাবে বলে দিল—সত্যিই আমরা অভিভাবকহীন। এখন যেন রাজ্য জুড়ে গুরুদশার সময়।

কোনও একটা চ্যানেল নাকি এই মৃত্যুকে—sudden demise হিসেবে বলেছে। সেটা নিয়ে ঠাট্টা করছিল আমার এক বন্ধু। ছিয়ানব্বই-উর্ধ্ব এক মানুষের সতেরো দিনের মরণসংগ্রাম কী করে 'sudden' বা অকস্মাৎ হতে পারে তাই নিয়ে। আমার মনে হল ব্যাকরণগতভাবে হয়তো এর মধ্যে ত্রুটি খুঁজলেও খোঁজা যায়। কিন্তু যে কোনও ঘনিষ্ঠ অভিভাবকের মৃত্যু যে কোনও বয়সে গিয়েই অকালমৃত্যু! সে আয়ুঃসীমা কি বয়স দিয়ে হয়, না আবেগ দিয়ে হয়, আমি জানি না।

শতবার্ষিকী পার করার পরও আমরা কি সত্যিই আজও মনে মনে বিশ্বাস করতে ভালবাসি না, যে নেতাজি আজও বেঁচে আছেন?

ধর্মীয় বিশ্বাস বা মার্কসীয় নীতির বাইরেও আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, শ্রীজ্যোতি বসুর সেই আত্মার চিরন্তন শান্তিকামনায়।





পরিচয়, ভাল লাগা বইটির সঙ্গে

He (Hamlet) gives me a pain in the ass.

হ্যামলেট আমার গুহ্যযন্ত্রণা।

শেক্সপিয়র-এর ভুবনখ্যাত নায়ক, ডেনমার্কের রাজকুমার সম্পর্কে এ-কথা লিখেছেন চার্লস ম্যারোউইট্‌জ। এবং লিখেছেন আরও অনেক কথা যা আমাদের গুহ্যদ্বারেও বেদনার মতো মোচড় দেয়। কিন্তু একই সঙ্গে অনিবার্যভাবে উস্কে দেয় শেক্সপিয়র-এর হ্যামলেট নাটকটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন ভাবনা।

ম্যারোউইট্‌জ-এর সঙ্গে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়তো আমরা আমাদের বদ্ধমূল ধারণা ভেঙে বেরিয়ে এসে একমত হতে পারি না। কিন্তু তাঁর গদ্যের বলিষ্ঠ প্রাবল্য, তাঁর যুক্তির ছক-ভাঙা মৌলিকতা, তাঁর 'সুপ্রিম' সাহস—এসব তো করাতের মতো কাটতে থাকে। রোধ করার উপায় নেই। শেক্সপিয়র-এর 'হ্যামলেট' নাটকটিকে এতটাই কাঁচা কাজ বলে মনে হয়েছে ম্যারোউইট্‌জ-এর যে তিনি নতুনভাবে 'হ্যামলেট' লিখলেন ষাটের দশকের শেষের দিকে। সত্তরের দশকের কোনও এক বর্ষা আর ছুটির দিনের দুপুরবেলা, এখনও মনে আছে, The Marowitz Hamlet, A collage version of Shakespeare's play by Charles Marowitz হাতে এল আমার। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম। শেষ হতে-হতে রাত হল। বিদ্যুৎ, মেঘের ডাক, উতল হাওয়া আর বৃষ্টি—সেই সঙ্গে কলেজ-জীবন থেকে মনের মধ্যে গেঁথে থাকা হ্যামলেট-ভাবনার ওপর ম্যারোউইট্‌জ-এর একের পর এক বজ্রাঘাত, এখনও ভুলতে পারিনি; বইটি শেষ করার পর একবুক তোলপাড় নিয়ে ঝোড়ো বৃষ্টির বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দ্য ম্যারোউইট্‌জ হ্যামলেট-এর এক দীর্ঘ-ভূমিকা লিখেছেন চার্লস ম্যারোউইট্‌জ ঈর্ষণীয় দীপ্যমান গদ্যে। ফালা-ফালা করে দিয়েছেন অলস, অকর্মা, নিষ্ঠুর, ফন্দিবাজ নায়কটিকে। সেইসঙ্গে উইলিয়াম শেক্সপিয়র-কেও। আমি তখন কলেজে পড়াই। এবং ইংরেজি অনার্স ক্লাসে হ্যামলেট পড়াই। ম্যারোউইট্‌জ-এর হ্যামলেট-মননে বিক্ষত আমি। ক্লাসে পড়াতে গিয়ে দেখলাম মাস্টারমশাই আর পশ্চিমী স্কলারদের 'শেখানো হ্যামলেট' আমার মনের মধ্যে ভেঙে চুরমার!

I despise Hamlet, লিখেছেন ম্যারোউইট্‌জ। হ্যামলেট-কে ঘেন্না করেন কেন? কারণ, He is a slob. A talker, an analyser, a rationalizer. Like the parlour liberal or the paralysed intellectual, he can describe every facet of a problem, yet never pull his finger out. Is Hamlet a coward, as he himself suggests, or simply a *poseur,* a frustrated actor who *plays* the scholar, the courtier, and the soldier as an actor (a very bad actor) assuming a variety of different roles?

And why does he keep saying everything twice? And how can someone talk so pretty in such a rotten country with the sort of work he's got cut out for him? You may think he's a sensitive, well-spoken fellow, but, frankly, he gives me a pain in the ass.

ম্যারোউইট্‌জ হ্যামলেট-কে দু'চোখে দেখতে পারেন না অনেকগুলো কারণে। প্রধান কারণ হল হ্যামলেট একটা হাঁদা-ভোঁদা-বোকা লোক যে বড্ড বকবক করে, সব কিছু বিশ্লেষণ করে নিজের যুক্তি দিয়ে সাজাতে চায়, কিন্তু এই 'পক্ষাঘাতগ্রস্ত' ভাবুকবাবুটি নিজে কিন্তু কোনও সমস্যা থেকেই বেরবার পথ খুঁজে পায় না। ক্রমাগত একটির পর একটি ভূমিকায় খাজা অভিনেতার মতো অভিনয় করতে থাকে। আর কেন জানি না প্রতিটি বাক্য দু-বার করে বলে! এমন জঘন্য একটা দেশ আর পরিবেশের মধ্যে অমন মিষ্টি-মিষ্টি কথাই বা বলে কেন ও? আপনারা ভাবতে পারেন মানুষটি বেশ মিষ্টভাষী এবং সংবেদী। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, হ্যামলেট আমাকে যন্ত্রণা দেয় গুহ্যদেশে।

এত বছর ধরে 'হ্যামলেট' নিয়ে যে-সব লেখালিখি হয়েছে তার মোটামুটি দু'টি ধারা—ঐতিহাসিক এবং মনস্তত্ত্বমূলক। দু'টি ধারাই কিন্তু হ্যামলেট-এর কবিতাকে বেশ গুরুত্ব দেয়। এই ধারা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছেন ম্যারোউইট্‌জ : If you reduce *Hamlet* to a behaviour-pattern, poetry becomes irrelevant, and metaphysical elements are expalined away by Freudian or Jungian tenets. ডেনমার্কের রাজকুমারকে তার 'কাব্য' থেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে নিয়েছেন ম্যারোউইট্‌জ। যা পড়ে থাকছে তা হ্যামলেট-এর ছিবড়ে। এই হ্যামলেট-কেও মহৎ ভাবতে পারা যায় কি? তা হলে হ্যামলেট-কে আজও আমরা মহৎ ট্র্যাজিক নায়ক ভাবি কেন? খুব সহজ উত্তর দিয়েছেন ম্যারোউইট্‌জ : তার মূল কারণ হ্যামলেট-এর ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন—যেমন বুথ, স্যর হেনরি আরভিং, ব্যারিমোর, গিলগুড, রেডগ্রেভ এবং স্যর লরেন্স অলিভিয়ের—এইসব মহৎ অভিনেতার জন্যই হ্যামলেট মহত্ত্বে উত্তীর্ণ। এঁরাই হ্যামলেটকে ট্র্যাজিক নায়ক বানিয়েছেন। হ্যামলেট-কে এইভাবে খানখান করার পর একটি মারাত্মক প্রশ্ন তুলেছেন ম্যারোউইট্‌জ : Is it possible, today, to sit through the play (*Hamlet*) as Shakespeare wrote it and still respond to its story and structure? ম্যারোউইট্‌জ সাহস করে মোদ্দা কথাটা বলতে পেরেছেন। কোনওরকম ধানাই-পানাই করেননি। পেরেকের মাথায় হাতুড়ি মেরেছেন সজোরে : The play has become, like a well-worn violin concerto or an opera, a test for virtuosity—either the actor's or the director's. 'হ্যামলেট' নাটকটি যে আজও আমরা দেখি তার কারণ একটাই—অভিনেতা বা পরিচালকের কালোয়াতি। কিন্তু শেক্সপিয়র-এর নাটক, ঠিক যেভাবে লিখেছেন শেক্সপিয়র, সেটা তো অসহনীয়। বসে দেখা যায় না। সুতরাং ম্যারোউইট্‌জ বদলে লিখেছেন শেক্সপিয়রের হ্যামলেট। সমকালীন দর্শকদের বসে-দেখার-যোগ্য করছেন নাটকটিকে। এবং এই নতুন 'হ্যামলেট'-এর ভূমিকায় এক ধাক্কায়



শেক্সপিয়র-কে নস্যাৎ করেছেন ম্যারোউইট্জ : For centuries, the nobility of *Hamlet* the poem has been confused with the man himself. হ্যামলেট-এর ভাষার মহত্ত্বকে কিন্তু হ্যামলেট-এর ওপর আরোপ করে আমরা যুগ-যুগ ধরে ভুল করে এসেছি। একটি মানুষের পক্ষে সম্ভব হতেই পারে অলংকৃত বাগ্মিতা। তা সত্ত্বেও মানুষটা নিজে হতে পারে মোমের তৈরি এক দুর্বল ভিতু জীব। হ্যামলেট-এর কপট বাগ্মিতাই হ্যামলেট-কে নবজাগরণের নায়ক করে তুলেছে। আসলে ও খড়ের মানুষ। খড়ের মানুষ হয়েও হ্যামলেট সারাক্ষণ সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা খুঁজছে এবং শোচনীয়ভাবে হাস্যকর হয়ে উঠছে—Hamlet desperately tries to adopt an acceptable social stance—এবং এখানেই শেক্সপিয়র-এর মোক্ষম দুর্বলতা, নাট্যকার হিসেবে। হ্যামলেট যখন সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে, তখন সে পাগলামির ভান করছে। শেক্সপিয়র হ্যামলেট-এর পাগলামিকেও রোমান্টিক মহত্ত্বে উত্তীর্ণ করার বৃথা চেষ্টা করেছেন। হ্যামলেট-এর 'মহৎ' পাগলামি প্রসঙ্গে ম্যারোউইট্জ লিখেছেন : Instinctively, he (Hamlet) feigns madness. Madness is the conventional escape route for human problems. এ-হেন প্রথাগত পলাতক সরণি-তে মহত্ত্বের কী আছে! হ্যামলেট-এর সামনে একটা বড় দায়িত্ব সর্বদা ঝুলছে—সে-দায়িত্ব হল কাকাকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। কিন্তু কাজটি ক্রমাগত পিছিয়ে দিচ্ছে হ্যামলেট। সে মনে-মনে ফুটছে এবং ক্রমাগত সেই ফুটের স্বাদু ব্যঞ্জনা ছাড়া আর কিছুই চাইছে না, এ যেন একটি রক্তমাংসের নারীকে কাছে পেয়েও পাণিমেহন করা, It is very much like the situation of a man who derives more satisfaction from masturbation and erotic imagery than intercourse with a real woman . স্বমেহনের নিঃসঙ্গ প্রেমহীন দহন থেকে শেক্সপিয়রের হ্যামলেট-কে বাঁচাতে চেয়েছেন ম্যারোউইট্জ। এবং তা করতে গিয়ে শেক্সপিয়রের নাটকটিকে টুকরো-টুকরো করেছেন তিনি এবং তারপর টুকরোগুলোকে তাঁর পছন্দের 'কোলাজ'-এ জুড়েছেন। নাম দিয়েছেন 'দ্য ম্যারোউইট্জ-হ্যামলেট'। এবং মনে করেন এ-নাটক শেক্সপিয়রের নাটকটির চেয়ে বেশি অর্থবহ, অবশ্যই বেশি সহনীয়। ম্যারোউইট্জ-এর 'হ্যামলেট'-এও হ্যামলেটের বিখ্যাত স্বগতোক্তিটি আছে, শুধু একটিই লাইন, টু বি অর নট টু বি। অবশ্য স্বগতোক্তি হিসেবে নয়, তার কথা সকলে শুনতে পাচ্ছে, এইভাবে :

Hamlet (weakly) : To be or not to be that is the question.

All laugh

(weakly) The Play's the thing wherein I'll catch the conscience of the king

(All laugh again).

(vainly trying to find the right words)

There is something rotten in the state of Denmark.

(The laughter sharply cuts out. A powerful stark silence issues from everyone).

দৃশ্যের শেষে হ্যামলেট ক্রমশ দুমড়ে-মুচড়ে কুঁজো হয়ে যাচ্ছে। এই আমাদের রোমান্টিক হিরো! ওফিলিয়া করুণার দৃষ্টিতে হ্যামলেটের দিকে তাকিয়ে, looks disgustedly at the slouched Hamlet. এরপর ওফিলিয়া-কে আমরা আর দেখি না ম্যারোউইট্জ-এর নাটকে। পাই না তার মৃত্যুর খবর। ম্যারোউইট্জ-এর ওফিলিয়া বেঁচেই থাকে। হ্যামলেট সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে যায়, কিংবা মরে, কিন্তু শেষবারের মতো জ্বলে উঠে খেলার তলোয়ারটা দিয়ে কাল্পনিক শত্রুদের মারতে থাকে। তারা মরতে থাকে। এবং তারপর সেই সব মৃত হ্যামলেটের দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর হাসতে থাকে!

দ্য ম্যারোউইট্জ হ্যামলেট ● চার্লস ম্যারোউইট্জ

বই চুরি

ও রে বাবা রে বইচোরের পাল্লায় কে পড়েনি? যারই বই আছে সে-ই বইচোর দেখেছে। বইচোরদের দেখলে চেনা যায় না, দিব্বি ভদ্রলোকের মতো দেখতে, এই আপনার আমার মতোই। কাঁধে ঝুলি, চোখে চশমা, ঝুলিতে বইপত্তর, মুখে বইপত্তরের গালগল্প। সব বইপ্রেমিক বইচোর নন, সব বইচোরও কিছু বই প্রেমিক নন, কিন্তু কিছু কিছু বইপ্রেমিক প্রকৃতপক্ষে বইচোরও বটে। তাঁদের ক্ষেত্রে কবির বাক্য একেবারে যথার্থ, 'আমার ভান্ডার আছে ভরে, তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।'

আমি তখনও বেশ ছোট, ইশকুলে পড়ি, পুলিনকাকু এসে হাসি হাসি মুখে মাকে বললেন, 'বউদি, মেয়েকে সামলান, সে এখনই ঘরের বস্তু বাইরে পাচার করতে শিখে গিয়েছে।' এই বলে একটি প্যাকেট খুললেন, 'আমি এই বইটি কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে পেয়েছি। নবনীতার জন্যে উপহার এনেছি।' বইটি দেবসাহিত্য কুটিরের এক পুজাবার্ষিকী, ভিতরে লেখা 'কল্যাণীয়া নবনীতাকে শারদীয়া উপহার, মা বাবা।' আমি তখনও কলেজ স্ট্রিটের অস্তিত্ব জানি না। আমাকে আরেকবার একটি বই বাড়ি বয়ে নিয়ে এসে একজন দেখিয়েছিলেন, উপহার দেননি, সেটি আমারই একটি বই, 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে', সত্যজিৎ রায়কে আমি সই করে উপহার দিয়েছি। সেটাও তিনি কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় কিনেছেন। সত্যজিৎ যথেষ্ট সাবধানী ছিলেন, তবু তাঁর ঘর থেকেও বেরিয়ে কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছে গিয়েছে। একবার আমার বাবা নরেন্দ্র দেবের স্বহস্তে কারুর বিয়েতে উপহার দেওয়া তাঁরই 'ওমর খৈয়াম' বই কলেজ স্ট্রিটে কিনেছিলেন আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক। এসব তো আমার জানতে পারা দু-একটা মাত্র চুরির খবর, আরও কত বই চুরি যে অজানা রয়ে গিয়েছে।

আমাদের বাড়ির তিনটে বই চুরির গল্প বলব। আমাদের বাড়িতে একজন করে গ্রামের ছেলেকে মা-বাবা আশ্রয় দিতেন, তাদের শহরে এসে কলেজে পড়ার সময়ে। স্রোতের মতো তারা আসতেন যেতেন। কেউ কেউ এখনও সম্পর্ক রেখেছেন। এরকম নানা ধরনের ছাত্ররা আমাদের বাড়ি থেকে পাশ করে গিয়েছেন। তাদেরই একজন একবার দেশে যাওয়ার সময়ে না বলে এ বাড়ির কিছু জিনিসপত্তর নিয়ে চলে গেল। শিবু ছুটল তার গ্রামের বাড়িতে, উদ্ধার হল প্রায় সবই। শিবু তাকে বললে, 'তুমি রুপোর গেলাশ চুরি করলে সেটা তো বুঝলুম, কিন্তু হঠাৎ দু'খন্ড রবীন্দ্র রচনাবলি কেন নিয়ে এলে?' সে উত্তরে বলেছিল, 'ওই তো একই বই একগাদা রয়েছে, আমি ভাবলুম দু'একটা নিলে কোনও ক্ষতি নেই। কেউ বুঝবে না।' সেটা ছিল বিশ্বভারতীর সেই আদি রচনাবলি, পুলিনকাকুর সম্পাদিত। বাড়ির সেটটা কানা হয়ে যেতে বেঁচে গেল। সে ছেলে আর পড়তে ফিরে আসেনি।

আরেকটা চুরি, ওই রকমেরই। একটি ছেলে এখানে থেকে পড়ছিল, একদিন তার ঘরে একটি সুশ্রী বাঁধানো বই দেখলুম, তাতে 'ল মো সা' লেখা সোনার জলে। তার নামের আদ্যক্ষর। বই হাতে নিয়ে দেখি আরে এ তো আমাদের বাড়িরই বই, 'রাধুকে বড়দা!' শরৎচন্দ্রের সই করা বই সে বাঁধিয়ে নিয়ে নিয়েছে। তাকে বাবা আর রাখতে সাহস করেননি। আমাদের বাড়িতে কিছুদিন প্রফুল্ল নামে এক রাঁধুনি এসেছিল, তার গর্ব, তার ভাই প্রেসিডেন্সি জেলে রান্না করে। পরে বুঝলুম সে দীর্ঘমেয়াদি কয়েদি, তাই রান্না করে। প্রফুল্ল ছিল ছিঁচকে চোর, তাকে সেই জন্যে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সে চলে যেতে না যেতেই আবিষ্কার করলুম ছাদের ঘর থেকে বাবার লোহার বাক্স বন্দি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা উধাও হয়েছে। ১৯১১-র এই বিশেষ সংস্করণটির এখন দুর্লভ বই হিসেবে ঐতিহাসিক মূল্য। বইটি বাবা তাঁর জামাতাকে যৌতুক দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা যাযাবর প্রাণী বলে বইটি জামাইবাবাজি শ্বশুরবাড়িতেই জমা রেখে গিয়েছিলেন। দর্মূল্য সেই বই হারিয়ে আমি তো পাগল হয়ে আমাদের পুলিশের বড়কর্তা বন্ধু আয়ান রশিদ খানকে ধরলুম, রশিদ বললেন দু'দিন হয়ে গিয়েছে, তাও চেষ্টা করে দেখি। বেশ কিছুদিন পরে উদ্ধার হল সেই বই, তার লোহার ওপরে এমবস করা কাম লেখা বাক্সটি আর নেই, বোধ হয় লোহার দরে বেচা হয়েছে। খণ্ড ২৯টি পাওয়া গেল, ধর্ষিত মথিত অবস্থায়। হারানো বই উদ্ধার করে এনে রাজ্য জয় করে ফিরে আসা সম্রাটের মতো রশিদের সেই আনন্দে গর্বে উজ্জ্বল হাসিমুখটি মনে পড়লে আমার ভীষণ মনে কষ্ট হয়। রশিদ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তার খুঁজে আনা বইগুলো আছে। সেই অসামান্য উপকারের কথা কোনওদিন ভোলবার নয়। তপনদা একদা এক বই চুরির গল্প বলেছিলেন, যেটা ইংরিজিতে

যাকে বলে 'টেকস দ্য কেক', সেটা না বললে কিছুই বলা হল না। গল্পটা কোথায় পড়েছেন আপাতত তাঁর মনে নেই। রবীন্দ্রনাথের কাছে এক ভদ্রলোক এসেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের ঘরে একটি নতুন বই দেখে উৎফুল্ল হয়ে আমাদের সকলের মতোই সেই আত্মাদেপনাটি করলেন, বইটি ধার চাইলেন দিন কয়েকের জন্যে। তার পরে আর যথা নিয়মে ফেরত দিলেন না। বেশ অনেকদিন ধরে রবীন্দ্রনাথ নানা কথায় ওই বইটি উদ্ধারের চেষ্টা করে বিফল হয়ে একদিন সেই অধমর্ণ ভদ্রলোককে বলেই ফেললেন, বইটি তাঁর প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু কোথায় যে গেল, কোথাও বইটা পাচ্ছেন না। তাঁর কপিটি হারিয়ে গিয়েছে। সান্ত্বনা দিয়ে ভদ্রলোক উদার সুরে বললেন, 'আপনার ওই বইটা চাই? বেশ তো, আমার কাছে ও-বই এক কপি আছে, আপনি নিশ্চয়ই নিতে পারেন।' বলে স্বচ্ছন্দে বইটি পরেরদিন বাড়ি থেকে এনে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে বইটি তুলে দিয়ে তিনি নিচু গলায়, সবিনয়ে বললেন, 'দশ টাকা।' দশ টাকা দিয়ে বইটি কিনে, খুলে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, ভিতরে তাঁর নামটি তখনও লিখিত আছে। নিজের নাম লিখিত বই সেকেন্ড হ্যান্ড বইয়ের দোকানে দেখেছি আমিও, কিন্তু সে জিনিস আর এ জিনিস তো এক নয়। এ চুরি যে সে চুরি নয়, সুপার বইচোরের স্মরণযোগ্য কীর্তি। চোখের চামড়া থাকলে এত উচ্চ স্তরের বইচোর হওয়া যায় না। আমাদের বাড়িতে বাবা মায়ের তৈরি গ্রন্থাগারটি একদা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রত্নাগার ছিল। প্রয়োজনীয় প্রচুর পত্র পত্রিকার সঞ্চয়ন ছিল আমার মা বাবার। তাঁদের মনেপ্রাণে অবিশ্বাসের লক্ষণ ছিল না বলেই আমাদের বইয়ের র‍্যাক ও আলমারিগুলির আজ এহেন দৈন্যদশা। আমি ছোট থেকেই দেখে আসছি অপরিচিত মানুষজন এখানে বসে সারাদিন, সারা সন্ধে গবেষণার কাজে বই কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। তাঁদের মাঝে মাঝে চা সাপ্লাই করা হত, কিন্তু যাওয়ার সময়ে কেউ তাঁদের ঝুলিগুলো চেক করত না। তাই আমাদের গ্রন্থাগার এখন বিকলাঙ্গ, পত্রপত্রিকার সম্ভার এখন ছিন্নপত্র, ছত্রখান, এবং অনেকটাই উধাও। আমি আস্তে আস্তে টের পেয়েছি যে, কোনও বে-পাহারা বইয়ের ঘরে ঝুলিসমেত বই-পাগলদের একা থাকার স্বাধীনতা দেওয়াটা বোধহয় কাজের কথা নয়। কেন বৃথা লোভ দেখানো? বই চুরি তো বন্ধ করা কঠিন, কিন্তু এখন বই ধার দেওয়া বন্ধ করেছি। কে কী নিল মনে থাকে না, উদ্ধার করতে পারি না। আমার মা-বাবার মতো হলে তো আমার চলবে না। সুকুমারীদির মতো হলে শ্রেষ্ঠ হত। তিনি সবাইকেই বই ধার দেন, কিন্তু যাকে যে বইটি ধার দেন, সেই বইয়ের জায়গায় তার নাম-ঠিকানা লেখা একটি কাগজ রেখে দেন। বেশি দেরি হলে, বা বইটার দরকার হলে তার কাছ থেকে চেয়ে নেন। এতে বই চুরির খুব অসুবিধে হয়। কেন না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বই চুরির প্রাথমিক উপায়, বই ধার নিয়ে ফেরত দিতে বেমালুম ভুলে যাওয়া। ওই ভাবে আমাদের এক পরিচিত ব্যক্তি এক চমৎকার লাইব্রেরি গড়েছে। এতে তার কোনও অপরাধবোধ নেই। অন্যের দানধ্যানেই তো লাইব্রেরি গড়ে ওঠার কথা! তার বিশ্বাস বইগুলো এখানেই অনেক বেশি কাজে লাগছে। অপরের বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এদিক-ওদিক তাকাইয়া সুযোগ বুঝিয়া না বলিয়া তুলিয়া লইয়া ঝুলিতে ভরিয়া ফেলার উপায়টিও বহুবিদিত এবং অতি প্রচলিত। বইমেলাতেও বই চুরির ঝুঁকি আছে প্রবল। মোট কথা যেখানেই বই আছে সেখানেই বইচোর আছে। বইচোরেরা নিজেদের চোর বলে মনে করেন না, তাঁদের বিশ্বাস তারাই প্রকৃত পুস্তকপ্রেমী, বই চুরি চুরি নয়, ইন্টেলেকচুয়াল এক্সারসাইজ।

ভালো-বাসার বৈঠকখানাতেই তো লাইব্রেরি, সে ঘরের বইগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখবার উপায় নেই। আড়ালে রেখেঢেকে চোরের চক্ষু থেকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় নেই। অনেকদিন আগে থেকেই আমাদের বাড়ির প্রতিটি তলায় প্রতিটি আসবাব ছদ্মবেশী বুক শেল্‌ফ হয়ে পড়েছে, মোড়া, টুল, এমনকী আলনা পর্যন্ত। এসব তো ছেড়েই দিচ্ছি, বইয়ের চাপে আমাদের জীবনযাত্রার বিঘ্ন ঘটছে, খাটের একটা ধার আটকে থাকে, চারতলার ঘর অব্যবহার্য, বই ঠাসা, দোতলায় উত্তরের বারান্দা আর খোলা যায় না, বই ভর্তি। লাল বাথরুম আর ব্যবহার করা হয় না, বইয়ের বোঝা রাখব কোথায়? রান্নাঘরের মাচাতেও বই। কোন বই যে কোনখানে সেটা কেউ জানে না, কোনও তালিকা নেই, ফলে বই থাকা না থাকা সমান। কাজের সময়ে খুঁজে পাই না। ধার করতে হয়। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় সব বইগুলি চুরি হয়ে ভালোয় ভালোয় বইপ্রেমিকদের কাছে চলে যাওয়াই মঙ্গল, সব দিক থেকে ভাল। তাতে তারাও যত্নে থাকবে। আমাদেরও বাড়িতে একটু হাত পা ছড়িয়ে বাঁচার স্থান সংকুলান হবে। বাবা মায়ের জমানো প্রচুর বই, আর আমার জমানো বই মিলে অনেক, তার ওপরে প্রত্যেকদিনই তো নতুন নতুন বই আসছে ঘরে। আমি চোখের জন্যে পড়তে পারি না, প্রাণে ধরে ফেলতেও পারি না কোনও বইই। কারুকে দানধ্যান করতেও পারি না। পড়তে পারি না, তবুও সম্পত্তি আঁকড়ে থাকা চাই। ওই যে, অবিকল সেই ছড়াটার মতন। 'ওখানে কে রে? আমি খোকা। মাথায় কী রে? আমের ঝাঁকা। খাস না কেন রে? দাঁতে পোকা। বিলোসনা কেন রে? ওরেএএ বাবা!!' বিলোনোর নামেই কার্পণ্য মাথা চাড়া দেয়। স্বেচ্ছায় তো একটাও ছাড়তে পারব না, এক কমার্শিয়াল স্তরের বইচোর ছাড়া এ সঙ্গীন অবস্থা থেকে ভালো-বাসা বাড়িকে কেউ মুক্ত করতে পারবে না।

এত ভাল ভাল কথা বলছি বটে, কিন্তু আজকাল বৈঠকখানা ঘরে তালা দেওয়া থাকে। আপনারা যেন আমার কথা বিশ্বাস করে ভালবেসে ট্রাই নেবেন না, আমার শর্ট সার্কিট টিভি ফিট করা আছে।

২৩.০১.২০১০

nabaneetadevsen@gmail.com

লিখিও উহা ফিরৎ দিবে কি না

সব কাজেরই একটা সংজ্ঞা থাকা উচিত। কিন্তু বই চুরির ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞা নিরূপণের কেস-টা অতীব কঠিন! কার লাইব্রেরির সম্পত্তি কখন ফুটপাত বদল করবে, কেউ জানে না।

আমি এ-যাবৎ এমন কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিনি যিনি বইয়ের প্রতি চক্ষুদান করেননি। পরের বইয়ের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি প্রক্ষেপণ কেবল নয়, সেই বই কিংবা বই-সমূহ নিজের বগল-দাবা করাকে চুরি বলা যায়—বলাও হয়।

তবে, 'চুরি' এই কথাটি ব্যবহার করার আগে এর একটা সংজ্ঞা তৈরি করতে হবে—সংজ্ঞাহীন হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। আমরা জানি 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে তাহাকে চুরি বলা হয়'। একটু ব্যাখ্যা দরকার—ধরা যাক, আপনি কোনও এক বন্ধুর বাড়ির বই-ঘরে দেখতে পেলেন একখানি বই, সে বইখানি দেখেই আপনার সেই বইখানি হাত করার ইচ্ছে হল। আপনি দেখলেন কাছাকাছি কেউ নেই—আপনি অমনি বইটিকে নিজের কাঁধের ঝোলায় ঢুকিয়ে নিলেন।—এটি চুরিই—অন্য কিছু নয়। চুরি হলেও এটা প্রমাণ করা সহজ নয়। কিন্তু যদি আপনি আপনার পরিচিত কারও কাছ থেকে একটি বা একাধিক বই ধার নেন এবং আর শোধ না দেন, তা হলে সেটিকে চুরি কি বলা যাবে? বলা যাবে না—কেননা না-বলে তো বই বা অন্য কিছু নেওয়া হয়নি। তা হলে এটিকে কী বলা যাবে—ডাকাতি? না ডাকাতি নয়। চুরি যে নয়, আগেই বলা হয়েছে। এটিকে আইনের ভাষায় বলা যাবে, ব্রিচ অফ প্রমিস। বিশ্বাসভঙ্গ বলতে হয় বাংলায়। তবে এটি প্রমাণ করা শক্ত—সাধারণত এর কোনও সাক্ষী থাকে না। আদালতে মামলা হতে পারে। কিন্তু এগারো বছর ধরে মামলা চললেও প্রমাণ করা যাবেই তার কোনও গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না। এই কীর্তি জোচ্চুরিও নয়—ছিনতাইও নয়। মোট কথা, আপনি ঠকে গেলেন। তাই এই কর্মকে ঠকবাজিই বলুন—আমিও তাই বলি। একে তা হলে বলা যাক চোরের ওপর বাটপাড়ি! তবে তাই হোক। বই ধার চেয়ে ফেরত না-দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত আছে—তাকে বলা হয় 'মেরে দেওয়া'। এই প্রসঙ্গে আমার এককালীন বন্ধু নিখিল সরকারের কথা বলি। নিখিলবাবুর সরকারি নাম নিখিল সরকার—ছদ্মনাম 'শ্রীপান্থ' নামেই বেশি পরিচিত। তিনি কয়েকখানি বই বিভিন্ন সময়ে আমার বই-খানা থেকে কিছুদিনের জন্য ঋণগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ফেরত দেওয়ার নাম করেননি। একটু অধৈর্য হয়েই একদিন ওঁকে বললাম, নিখিলবাবু আমার বইগুলো আপনি মেরে দিলেন না কি? তিনি এর যে উত্তর দিয়েছিলেন তা চিরস্মরণীয়—ক্লাসিকও বলা যায়। তিনি ধীরে ধীরে একটু বেদনামিশ্রিত কণ্ঠে বলেছিলেন—হিমানীশবাবু এটা ঠিক যে, আপনার কাছ থেকে কয়েকখানি বই কিছুদিনের মধ্যেই ফেরত দেব বলেছিলাম এবং বারংবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও আমি বইগুলো ফেরত দিইনি। কিন্তু তা বলে আপনার বইগুলো সব আমি মেরে দিয়েছি এ কি একটা ন্যায়সংগত কথা হল?

আরেকবার তাগাদা দিলে তিনি বলেছিলেন, আমি আপনার কাছ থেকে যে-সব বই ধার নিয়েছিলাম, সেগুলোর নাম কি আপনার মনে আছে?

নিখিলবাবুর এই জবাবে আমি লা-জবাব!

সত্যি, ওই বইগুলোর নাম আমার মনে ছিল না। তখন তিনি আমাকে বললেন, হুম, নাম যখন মনে নেই, তা হলে বইগুলো আপনার ফেরত না পেলেও চলবে।



আরেক রকম চুরির কথা বলা যাক। জনসাধারণের সুবিধার্থে বিনা খরচায়, কখনও বা যৎসামান্য নগদের বিনিময়ে, বই পড়ার ব্যবস্থা কলকাতাতে অনেক আছে—যেমন, রামমোহন লাইব্রেরি, নগেন্দ্র লাইব্রেরি। সেখানে দেখেছি—শুধু তাই নয়, এককালে যখন প্রায় ন্যাশনাল লাইব্রেরি'তে নানাবিধ বিষয় পড়তে যেতাম, সেখানেও দেখেছি—অনেক বইয়েরই দু-চারখানা করে পাতা নেই। দাড়ি কামানোর ব্লেড দিয়েই (মনে হয়)—সুকর্তিত। হাতে-কপি করার যে ঝামেলা কত, সেটা কেউ বুঝবে না তা কি হতে পারে? দু'ঘণ্টার জায়গায় দু'মিনিট, সময়ের দাম নেই!

এ-প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এর প্রসঙ্গ মনে পড়ছে। রাণু নিজের পাঠ্যপুস্তক নিজেই লুকিয়ে রাখত—কেউ জিগ্যেস করলে বলত—ওই বইয়ের পড়া হয়ে গিয়েছে, আর রাখার দরকার কী বইটা? যুক্তি যে অত্যন্ত সরেস সন্দেহ নেই। আরেকটা চুরির কথা শুনেছিলাম রমাপদ চৌধুরীর কাছে। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে একটি ছোটগল্প পাঠিয়েছিলেন, প্রকাশের জন্য। বন্ধু সম্পাদক—গল্পটিও ছিল চমৎকার। গল্পটি







সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে সম্পাদকের নিজের নামে। বাংলার অন্যতম সেরা সরস গল্পলেখক রাজশেখর বসুও একাধিক গল্প 'মেরে' দিয়েছেন—খোদ উডহাউস থেকে। তিনি শুধু প্লট ব্যবহার করেছিলেন; কিন্তু ইংরেজ লেখকের নামটি কখনও দেননি। অন্যায় কোথায়! স্বয়ং শেক্সপিয়র-ও নাটকের বহু প্লট অন্যের রচনা থেকে 'মেরে' দিয়েছিলেন—তবে? শিবরাম প্লট টুকতেন, সেটা তিনি স্বীকারও করতেন—কেননা তা লজ্জার নয়—অপরাধও নয়। এ-ব্যাপারে উল্লেখ করতে হবে ইন্দ্রমিত্র এবং তারাপদ রায়ের নাম। উল্লেখ করতে হবে সমরেশ এবং বুদ্ধদেব বসুকেও।

বই চুরি কে করে না?

সকলেই অবগত আছেন রক্ষক-ভক্ষকের কথা। বড়-বড় সরকারি-বেসরকারি লাইব্রেরি থেকে বই হাওয়া করা হয়। শুনেছি, ন্যাশনাল লাইব্রেরির বিরল প্রজাতির বই বড়কর্তারা হাপিশ করে দিয়েছেন। রাইটার্স বিল্ডিং-এর লাইব্রেরি থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রজাপতিগণ বহু বই ধার নিয়ে অনেক তাগাদা সত্ত্বেও ফেরত না-দেওয়ার ঘটনা শোনা যায়। লন্ডনের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। ওখানকার আমেরিকার দূতাবাসের লাইব্রেরি-র সভ্য ছিলাম কি না জানি না, তবে সদস্য ছিলাম বলে ফোন করে বই আনানো যেত—পয়সাকড়ি লাগত না। একবার আমি আমার প্রিয় কার্টুনিস্ট স্টাইনবার্গ-এর একটা ঢাউস বই আনিয়ে নিলাম। সেটি এক বন্ধু পড়তে নিল, নিয়ে আর ফেরত দিল না—সে কাউকে পড়তে দিয়েছে—ওই বন্ধুটি আর ফেরত দেয়নি। বইটির দাম ছিল প্রচুর। শর্ত অনুযায়ী বইটির দাম আমাকে কড়ায়-গণ্ডায় ফেরত দিতে হল। এরপর আরেক কীর্তি। যে-বন্ধুর হেফাজত থেকে বইটির নিরুদ্দেশ-প্রাপ্তি ঘটেছিল, আমার সেই বন্ধুটি, তার বন্ধুর কাছ থেকে বইটি আদায় করে নিয়ে আমাকে প্রত্যর্পণ করে। বইটি আপাতত আমার জিম্মায়। অবরেসবরে এখনও উল্টেপাল্টে দেখি।

'শনিবারের চিঠি'-র বিখ্যাত সম্পাদক—নিপাতনে সিদ্ধ সজনীকান্ত দাশের বইয়ের ছিল বিরাট সংগ্রহ। বহু লেখক এবং প্রকাশক তাঁকে বই উপহার দিয়েছেন। তা ছাড়া তিনি নিজেও পুরনো বইয়ের দোকান থেকে খুব সস্তায় বই কিনতেন। প্রচুর বই পড়তেন। খুবই খুঁতখুঁতে পাঠক ছিলেন। মনে হয় ১৯৫৯-'৬০ সালে ওঁর লাইব্রেরি-টি সরকারকে বিক্রি করবেন—দাম? তিনি বললেন, এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা! ওই সময়ের পক্ষে যথেষ্ট চড়া দাম। বিধানচন্দ্র রায় তখন মুখ্যমন্ত্রী। দাম শুনে তিনি বললেন, তুমি যে-দাম ধার্য করেছ তা সঙ্গত হয়েছে কি না যাচাই করে দেখতে হবে। সরকারের তো একটা নিয়ম-নীতি আছে! বিধানচন্দ্র রায় তাঁর পরিচিত অমল হোম-কে নিয়োগ করলেন—তিনি দু-তিনজন কেরানি নিয়ে সজনীকান্ত দাশের বাড়িতে সকালের দিকে গিয়ে দুই বন্ধুতে আড্ডা জমাতেন—খাওয়াদাওয়াও হত। সজনীকান্ত ভোজনরসিক মানুষ। খেতে ভালবাসতেন, খাওয়াতেও। দুই বন্ধুতে গল্পগুজব হয়—ফাঁকে ফাঁকে অমলবাবু লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে কাজের গতি খতিয়ে দেখেন। একদিন—অমল হোম তাক থেকে কয়েকটি বই বার করে তাজ্জব! বললেন, ওরে সজনী, এর মধ্যে অনেক বই তো আমার লাইব্রেরির!

ঘটনাটি সত্যি—অমল হোমের কাছে আমি শুনেছি—স্বকর্ণে শুনেছি বলাই যায়।

বিখ্যাত কবি, চিত্রশিল্পী এবং আরও অনেক গুণের মানুষ পূর্ণেন্দু পত্রী-র জীবনের একটি সত্যি-কাহিনিকে পুকুরচুরি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বইচুরি সংক্রান্ত ঘটনা। তাই বৈপুকুর চুরিও বলতে পারেন। পূর্ণেন্দু পত্রী, সম্ভবত নিজেরই খরচে, ছোটদের জন্য ছোট একখানা চটি-বই প্রকাশ করেন—'কেমন করে কলকাতা হল'। দামও কম—সাড়ে সাত টাকা। এক শুভার্থী প্রকাশক তাঁকে সুপ্রস্তাব দিলেন। বললেন, বইয়ের দাম বড়ই কম ধার্য করেছেন—দাম করুন পনেরো টাকা। দু'হাজার বই ছাপিয়ে দেব সরকারি যোগসাজসে—তা হলে প্রতি বইতে আপনার জন্য পাঁচ টাকা উপহার থাকবে। হাজার বইতে পাঁচ হাজার টাকা, মন্দ কী? পরিষ্কার বন্দোবস্ত—মোটেই জটিলতা নেই। পূর্ণেন্দু পত্রী



এ-প্রস্তাবে রাজি হননি। বৈ-পুকুর চুরি যেমন আছে, তেমন বৈ-সমুদ্র চুরিও হয়। সেখানে ক্যাশ মেমো থাকে, হিসেবখাতার পাতায়-পাতায় বইয়ের নিখুঁত হিসেবও থাকে—কেবল বই থাকে না। এরকম কারবার আমরা স্কুলজীবন থেকেই দেখে আসছি। হয়তো এখনও এই সাবেক প্রথা চালু আছে।

বই চুরির পাশাপাশি বই-ডাকাতিও হয়। একবার কলকাতার খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন থেকে কয়েকশো খণ্ড গান্ধী রচনাবলি ডাকাতি হয়েছিল। বইগুলো পড়ে ডাকাতদের আত্মার উন্নতি হয়েছিল কি? সৎসঙ্গে মিশে ডাকাতি করা ছেড়ে ওরা কি শেষ অবধি অনাহারে অসুস্থ হয়ে অকালে মারা গিয়েছিল? কে জানে!

বই চুরি নিয়ে কথা হচ্ছে, অথচ ঠাকুরবাড়ি-র প্রসঙ্গ আসবে না তা কি হয়?

এটা বলার দরকার নেই যে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে প্রচুর বই ছিল। এবং যে-বাড়িতে অত বই সে-বাড়িতে বইচোরও থাকবে। অবনীন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানতে পারি, তাঁদের বিখ্যাত বৈঠকখানা থেকে অসংখ্য বইয়ের একখানি উধাও হয়ে গিয়েছিল। সেটি দরকারি বই—কিন্তু সন্দেহ কাকেই বা করা যায়! তখন এক ভূতের আমদানি করতে হল। একদিন বৈঠকখানায় বৈঠক চলছে। হঠাৎ একজন বললেন, আরে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পেন্টিং-টি তো অনেকখানি বেঁকে রয়েছে। নিশ্চয়ই কোথাও একটা অন্যায়-অঘটন ঘটেছে। তার জেরেই মহর্ষির আত্মা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মনে হয়, এই ঘর থেকে কোনও কিছু চুরি হয়েছে—হয়তো কোনও দরকারি বই। যদি উপস্থিত কেউ কিছু সরিয়ে থাকেন তা হলে সেটা কাল সকালের মধ্যে ফেরত দিলে আত্মা সন্তুষ্ট হবেন। পরদিন অবশ্যই দেখা গেল বইটি স্বস্থানে ফেরত এসেছে আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছবিটিও সোজা। ভূত ঝাড়বার ওঝারা নিশ্চয় এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

এবার একটি ঘটনার উল্লেখ করব—তার সত্যতা নিয়ে আমার গ্যারান্টি রয়েছে—পাঁচ বছরের। কয়েক বছর আগে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হল-এ শিবরাম চক্রবর্তী এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য স্মরণে একটি সভাতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তখন আমার চোখ এখনকার মতো এতটা ঝাপসা হয়নি। সেখান থেকে পণ্ডিতিয়া রোডে ফেরার কথা। উদ্যোক্তারা ট্যাক্সিভাড়া আমাকে দিয়ে বললেন, ওই রুটে অন্য কেউ যেতে চাইলে যেতে পারেন। এক ভদ্রলোক উঠে পড়লেন গাড়িতে। আমি অকুস্থলে পৌঁছে যাওয়ার পর তিনি ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলেন সেলিমপুর রোডের দিকে। সঙ্গের ভদ্রলোকের নামটা শুনেছিলাম—অর্ধেন্দু চক্রবর্তী।

কয়েক দিন পর দেখি একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার দশ-বারোখানা কবিতার বই পণ্ডিতিয়া রোডের বাসায় দারোয়ানকে দিয়ে গিয়েছে। বইগুলোতে লেখা রয়েছে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু অর্ধেন্দুদা-কে'। তারপর কবির নামস্বাক্ষর ও তারিখ। পণ্ডিতিয়া রোডের ওই ঠিকানায় থাকতেন আমার খুড়তুতো বোনের কর্তা অর্ধেন্দু রায়চৌধুরী। ফলে, দারোয়ানের সন্দেহ হয়নি। কিন্তু আমি জানি আমার আত্মীয় অর্ধেন্দু রায়চৌধুরী কবিতা লেখেন না। তা হলে এই 'অর্ধেন্দুদা' কে? কী করা যায়! অন্যের বই, ফেরত না দিতে পেরে অস্বস্তি হচ্ছে। তখন অনেক ভেবে উদ্যোক্তাদের একজনকে টেলিফোন করে অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর ফোন নম্বর জোগাড় করলাম। নম্বর পেয়ে, পরদিন অর্ধেন্দু চক্রবর্তী-কে ফোন করে বললাম বিষয়টি। অর্ধেন্দু সবটা শুনলেন। কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপর খুকখুক করে হাসলেন— অল্প হাসতে হাসতে হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। আমি তো অবাক। হচ্ছে কী ব্যাপারটা! তখন অর্ধেন্দু চক্রবর্তী আমাকে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন। ওই বইগুলো আমারই। তবে আমি ইচ্ছে করেই ট্যাক্সিতে বইগুলো ফেলে এসেছিলাম। জানেন তো, কলকাতায় কত কবি আছেন? কবিতার বই তো কেউ কেনে না, তাই কবিরা নিজেদের বই দেদার উপহার দেন। আমার বাড়িটা খুব ছোট—বেশি জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে ট্যাক্সি, রিকশা, ট্রেন—যাতে চেপে যেখানেই যাই—আমি বইয়ের প্যাকেট 'ভুল' করে ফেলে আসি। বুঝলেন তো!

এই আকস্মিক ঘটনার সবচেয়ে সুখকর দিক হল : পরম রসিক পরম অমায়িক অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার গভীর সখ্য তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন সপ্তাহে একাধিকবার তাঁর দর্শন পাই। টেলিফোনেও কথা হয়। মাঝে-মাঝে ওঁর স্ত্রীর রান্না করা খাবারদাবার তিনি নিয়ে আসেন আমার জন্য।

বইচুরি অনেককে অনেক কিছু দেয়। কাউকে যন্ত্রণা, কাউকে পুলক, কাউকে রোমাঞ্চ। আমাকে দিয়েছে আত্মার আত্মীয় এক বন্ধু। মন্দ কী!

ছবি : হিমানীশ গোস্বামী

বইচোর ▲ ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়

হাতে-বাজারে

বইমেলা ও বইচুরি, গঙ্গা-যমুনা। গিল্ডের কর্তা হওয়ার দরুন চোরের ঝুলি থেকে হরেক রঙের বেড়াল বেরোতে দেখেছেন।

দাদা, ওপরের ওই বইটা একটু দেখাবেন?

—কোনটা?

—ওই যে, র‍্যাকের কোনায়।

—দুরন্ত ঈগল?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ...একটু দিন না।

—দাদা, 'নন্টে ফন্টে' এই পার্ট-টার দাম কত?

—তিন টাকা।

—দাদা, এই বইটা ভাল হবে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ভাল।...প্লিজ, একটু দাঁড়ান। এক-এক করে দিতে দিন।

এই কথোপকথন যখন চলছে, ততক্ষণে বিক্রেতার চোখ এড়িয়ে নিঃশব্দে কয়েকটি বই ঢুকে পড়েছে ঝোলায়, ব্যাগে।

স্থান : কলকাতা বইমেলার মাঠ। সময় আশির দশকের গোড়ার দিকের যে কোনও বছর। কোনও একটা ছুটির দিন।

যে কোনও বছর বললাম এই জন্যে যে ওই সময় আমাদের স্টলে আমাদের প্রতিষ্ঠান 'পত্র ভারতী'-র শুরুর সময়। লোকবল সামান্য। আমরা নিজেরাই থাকতাম। র‍্যাক জুড়ে থরে-থরে সাজানো বইমেলায় সদ্যপ্রকাশিত নানা বই। আমি নিজে দাঁড়াতাম যে কোনও একটি দিকের র‍্যাকের সামনে। উদ্দেশ্য দু'টো। বই-চুরি হচ্ছে কি না নজর রাখা, আর পাঠক-পাঠিকাদের বই সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া।

প্রায় প্রতি বছরই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে। তরুণ-তরুণীরা আসত দল বেঁধে। এক ঝাঁক ঢুকে পড়ত। নিজেদের মধ্যে কলরব শুরু করত। 'দ্যাখ দ্যাখ কী দারুণ বই।' 'অ্যাই তাপসী, একটা কমিক্স কেন না?' 'আমি বাবা 'নিজে করো' কিনব। দিন তো দাদা।'

স্টলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তারা প্রশ্নে-প্রশ্নে জেরবার করে দিত আমাদের স্টলের বন্ধুদের। তারা বই দেখাতে যখন ব্যস্ত, সেই ফাঁকেই টুক টুক করে সরে যাচ্ছে এ-হাত থেকে ও-হাতে বই...শেষে স্থান হচ্ছে সেই ঝোলায়।

প্রায়শ এমন দেখেছি, আমাদের স্টল থেকে বেরিয়ে সেই তরুণ-তরুণীর ঝাঁক একটু দূরে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে 'হাত সাফাই' করা বইগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে গভীর আলোচনায় মগ্ন। হাতে-হাতে বইগুলো ঘুরছে। শুধু যে আমাদের স্টল থেকে লিফ্ট করা বই, তা কিন্তু নয়। অনেক-অনেক দোকানের, নানারকমের বইয়ের বেশ বড়সড় সম্ভার।

তাদের কথোপকথনও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চুপচাপ শুনেছি।

'তুই বাঁটুলটা পড়ে আমায় পরশু দিবি। আমি নন্টে ফন্টে দেব।'

'নন্টে ফন্টে পড়ার পর আমার কিন্তু ফেলুদা চাই। অ্যাই অনিতা, কবে দিবি রে?'

'আরে, দু-চারটে দিন সময় দে।...কাকাবাবু তুলেছিস?'

'হ্যাঁ, ওটা সম্বিত নিয়েছে। সবুজ দ্বীপের রাজা। দারুণ। আমি আনন্দমেলা-য় পড়েছি।'

'কিশোর ভারতী-র ভাবা পড়েছিস? ভালুক-বালক! ওটা কিংশুক নিয়েছে। ওর কাছ থেকে নিতে হবে।'

'আচ্ছা, সুস্মিতারা কোন দিকে গেল বল তো?'

'ওরা রূপা-র দিকে গিয়েছে। বলা আছে, পাঁচটায় সবাই অডিটোরিয়াম-এর সামনে মিট করব। তারপর একসঙ্গে বেরুব।'

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শুনেও হাত কামড়ানো ছাড়া করার কিছু নেই। কারণ একবার বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে গেলে ওরা 'ফ্রি'।

আরেক ধরনের 'বইচোর'-ও দেখেছি। একাই হয়তো এসেছে। র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে বই বা কমিক্স পড়ছে। পড়তে-পড়তে একটা চট করে ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল। আরেকখানা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কাউন্টারে। ক্যাশ মেমো করাতে। বাই ওয়ান, গেটওয়ান ফ্রি!

আগেই বলেছি, এই কীর্তি বা দুষ্কর্ম সবই ঘটে প্রবল ভিড়ের সময়। যেদিন বইমেলার মাঠে শুধু মানুষ আর মানুষ। স্টলগুলোর সামনে লম্বা লাইন। ভিতরে থিকথিকে ভিড়।

সেইসব দিন হল 'বইচোর'-দের বড় আনন্দের দিন। বিক্রেতাদের একইসঙ্গে আনন্দিত ও আতঙ্কিত হওয়ার দিন। হু-হু করে বই বিক্রি হচ্ছে, ক্যাশ-বাক্স উপচে পড়ছে, আবার সুট সুট করে ক্যাশ মেমোহীন বইও পাচার হয়ে যাচ্ছে।

তবে এই 'বইচোর'দের কি অন্য চোরেদের সঙ্গে এক গোত্রে ফেলা যায়?

খুব কঠিন প্রশ্ন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সব 'বইচোর'-কে এক সারিতে ফেলা উচিত নয়। যাদের কথা এতক্ষণ বলেছি, তারা মূলত এক শ্রেণির। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়ে। বই পড়ার খিদে প্রচুর, অথচ হাতে তেমন টাকা নেই, যা দিয়ে 'লোভনীয়' এবং 'প্রিয়' বই কিনতে পারে।

চুপিচুপি এই ফাঁকে স্বীকারোক্তি করে নিই, 'বইচুরি'-র মধ্যে যে একটা নিষিদ্ধ আনন্দ আছে, উত্তেজনা আছে, অস্বীকার করি কী করে! আমিও কি এই দলের বাইরে? কলকাতা বইমেলা যে-বছর শুরু হয়, সেই '৭৬-এ আমি কলেজে। তখন থেকেই আমার প্রতি বছর বইমেলায় যাওয়া শুরু।

'৭৮-'৭৯-র মধ্যে তরতর করে বেড়ে উঠল বইমেলা। ছুটির দিন হলে বেশি ভিড়। তখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সদলবলে গিয়েছি। এবং সুযোগ পেলে বইয়ের চক্ষুদান করেছি। ভাগ্যদেবী কৃপা করেছিলেন, হাতেনাতে ধরা পড়িনি। আমার বন্ধু তিলক (এখন মিশিগান-এর অধ্যাপক) 'রূপা' থেকে জেমস বন্ড-এর বই সরাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল।

না না, প্রকাশক বা বই-বিক্রেতারা কখনও-ই এই 'চোরেদের' ওপর বিশেষ লাঞ্ছনা করেন না! বই যেমন আর পাঁচটা পণ্যের চেয়ে আলাদা, বই-তস্কররাও একটু বিশেষ মর্যাদা পায়।

কিন্তু একেবারে ছেড়েও দেওয়া হয় না। নানাবিধ 'শাস্তি'-র ব্যবস্থা আছে।

তবে তার আগে বইচোরেদের অন্য দু-একটা শ্রেণির কথা বলা দরকার।

গত কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ করছি, বই পড়ার জন্যে নয়, বই-বেচার জন্যে একদল নব্য বইচোরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে!

এরা বেশ মোটা-সোটা, দামি বই টার্গেট করে। দলবদ্ধভাবে আসে। ধরা পড়লে অস্বীকার করে, চিৎকার-চেঁচামেচি করে 'সিন ক্রিয়েট' করে! এরা একেবারেই লেখাপড়ার জগতের নয়। যেমন ধরুন, একবর্ণ বাংলা পড়তে পারে না, এমন একটি অবাঙালি দলকে ধরা পড়ার পর দেখা গেল, তাদের কাছে বুদ্ধদেব গুহ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ক্লাসিক ও জনপ্রিয় একগুচ্ছ মোটা দামি বই রয়েছে।

কবিতা নিয়ে জয় গোস্বামীর প্রথম ধারাবাহিক কলামগুচ্ছ



গোঁসাইবাগান
প্রথম খণ্ড

এখানে নিজের কিছু প্রিয় কবিতা নিয়ে তাঁর অনুভূতি জানিয়েছেন জয় গোস্বামী। এক একটি কবিতা ধরে ধরে জানিয়েছেন — কেন এই বিশেষ কবিতাটি এই মুহূর্তে ভালো লাগছে তাঁর। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে খুঁজে দেখা হয়েছে কবিতার অর্থকে। এই দেখাটাই যে সেইসব কবিতাকে বোঝবার একমাত্র বা অভ্রান্ত পথ সে-দাবি নেই কোথাও। তবে এই দেখা যে এক নতুন ধরনের দেখা, সন্দেহ নেই তাতেও। কবিতা যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের কাছে এই বইটি হয়তো দরকারি মনে হতে পারে। ৩০০্

উপন্যাস

কুণাল ঘোষ
তখনও সবটা বলিনি



রোশনি। অমৃতা। সোনালি। আর তিস্তা। কলকাতার ফ্ল্যাটে পেয়িং গেস্ট। পিছনে চাররকম অতীতের চালচিত্র। চারপাশে চাররকম বর্তমানের ঘূর্ণাবর্ত। সামনে চাররকম ভবিষ্যতের হাতছানি। বাংলা ছবির এক মহানায়কের স্পর্শে চূরমার পারিবারিক কাঠামোর সঙ্গে যুদ্ধ করে রোশনি জিততে পারল? ১০০্

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
গদ্যসমগ্র প্রথম খণ্ড : চলচ্চিত্র



বাংলায় চলচ্চিত্র নিয়ে লেখালিখির প্রবল প্রবাহের মধ্যে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে নতুন স্রোত। ভাষায়-ভাবনায়-বিন্যাসে-ব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণ মৌলিক। সত্তরের দশকে 'দেশ' পত্রিকার নিয়মিত চলচ্চিত্র-প্রবক্তা ছিলেন তিনি। তাঁর সেইসব নতুন স্বাদ-ভাবনা-স্টাইলের লেখা সূচনা করেছিল চলচ্চিত্র-সমালোচনার নবযুগ। তাঁর আগে বা পরে অমন লেখা আর হয়নি। রঞ্জনের গদ্যসমগ্রের আসন্ন খণ্ডে অবিস্মরণীয় সেই লেখা গ্রন্থিত হবে। তিনি চলচ্চিত্র নিয়ে আজও লেখেন সংবাদ প্রতিদিন-এ কখনো-কখনো। এবং যখনই লেখেন, তাঁর লেখায় ঘটে যায় মেধা ও ভাষার, মৌলিকতা আর বৈদগ্ধ্যের বিরল রসায়ন। ২৫০্



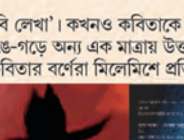
আলোর জাদুকর

তাপস সেন
অন্তরঙ্গ আলো ২০০্

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

২৫% ছাড়ে বই কিনুন

বইমেলার মাঠে আমাদের স্টল থেকে ৫০০ টাকার বেশি মূল্যের বই কিনলে দ্বিতীয়বার বই কেনার সময়ে সমমূল্যের বই ২৫ % ছাড়ে কিনতে পারবেন আমাদের প্রকাশনা অফিস থেকে।



২০০ টাকার বই কিনলে উপহার হিসেবে পাবেন সুদীপ্ত সাধুখাঁ-র স্বরচিত কবিতা পাঠের সিডি 'সঙ্গে যাওয়ার অসাবধানে'।

স্টল নং-২৮৭

পল্লববরন পাল-এর
ছবি ও কবিতার অ্যালবাম
প্রতিবেশী বর্ণমালা

এ এক অনন্য মৌলিক প্রতিবেশ নির্মাণ— এক অন্যরকম 'ছবি লেখা'। কখনও কবিতাকে নিয়ে বসিয়েছেন নিজস্ব ছবির উঠোনে, কখনও ফটোগ্রাফ বা কোনো সংগৃহীত ছবিকে প্রযুক্তিযন্ত্রে ভেঙে-গড়ে অন্য এক মাত্রায় উত্তরণ ঘটিয়ে নির্মাণ করেছেন কবিতা। এমনি অসংখ্য নির্মাণ থেকে ১২টি নিয়ে এই স্তবক যেখানে ছবি ও কবিতার বর্ণেরা মিলেমিশে প্রতিবেশী বর্ণমালা... ১৫০্





আমরা দেখেছি, এদের সংগঠিত দলও আছে।

এদের প্রতি আমাদের কারও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। স্টলের বিক্রেতারা এদের সম্পর্কে এখন খুবই সাবধান হয়েছেন। এমনকী নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত এদের পুলিশ বা সিকিওরিটি-র হাতে তুলেও দিতে হয়েছে।

কিন্তু পড়ুয়া 'আদি-অকৃত্রিম' বইচোরদের কিন্তু কখনওই কেউ পুলিশ বা সিকিওরিটি-দের হাতে তুলে দেন না। বড় জোর বইমেলার অফিসে পৌঁছে দিয়ে যান।

হ্যাঁ, বইমেলার গিল্ড অফিসে এমন অনেক শিক্ষিত, সুবেশ তরুণ-তরুণীকে ম্লান মুখে বসে থাকতে দেখেছি। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মশাইকে দেখেছি এদের সঙ্গে কথা বলতে।

তখন শ্যামাপদবাবুর পাথরের মতো মুখ। ঠিক সংস্কৃত পণ্ডিতের মতো চেহারা। ধুতি-পাঞ্জাবি, জহরকোট। সোফায় পায়ের ওপর পা তুলে বসে তিনি।

ভয়ে কাঁচুমাচু এদের এক-একজন করে ইন্টারভিউ নিতেন শ্যামাপদবাবু।

'কী নাম তোমার?'

'অমিত।'

'বাঃ! কী করো?'

'কলেজে পড়ি।'

'বাঃ! কী সাবজেক্ট?'

'ইংরেজি অনার্স।'

'খুব ভাল। ওই জন্যে এই বইটা নিয়েছ?'

নিরুত্তর।

'হুঁ। সমারসেট মম-এর বই। এঁর গল্প পড়েছ?'

'না প্-পড়তে চাই।'

'বেশ। শেক্সপিয়র পড়েছ?'

'একটু-একটু।'

'চমৎকার। অ্যাই সত্য, একটা খাতা দিয়ে যাও তো।...এই নাও। এতে এক পৃষ্ঠার মধ্যে নির্ভুল ইংরেজিতে শেক্সপিয়র সম্পর্কে যা জানো, লিখে ফেলো।'

প্রতিপক্ষ নিথর।

'দ্যাখো বাপু, না লিখতে পারলে এই বইটা তোমায় টাকা নিয়ে কিনতে হবে।'

'ট্-টাকা অত নেই।'

'জানি তো। তাই বলছি, লিখে ফেললে অর্ধেক দামে বা ফ্রি তোমায় দিয়ে দেব। তবে হ্যাঁ। ভুলভাল লিখলে কিন্তু ডাব্‌ল ফাইন।...যা লিখবে, সেটা চেক করা হবে।'

'আর করব না স্যর। এবারের মতো ছেড়ে দিন।'

শ্যামাপদবাবু কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন, 'হুম। ছাড়তে পারি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। তুমি ইংরেজিতে অনার্স পড়ছ। তোমার দোষ স্বীকার করে নির্ভুল ইংরেজিতে একখানা আবেদনপত্র লেখ। ভুল হলে কিন্তু ছাড়া পাবে না।...'

বইচুরির আরেকটি শাস্তি আজকাল চালু হয়েছে। সেটা হল, পুরো দাম দিয়ে বইটি কিনে নিতে হবে। সেটা অবশ্য অনেকে পারে না। বেচারি কোথায় পাবে কেনার টাকা? তখন একটুক্ষণ আটকে রেখে ছেড়ে দেওয়া হয় শেষপর্যন্ত।

বইচোর-দের নিয়ে এমন কত স্মৃতি! লিখতে গেলে এক জাহাজ হয়ে যাবে।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এদেরই আরেক দলের অপারেশন স্টাইল হচ্ছে—বেশ কিছু মোটা ও দামি বই নিয়ে সটান স্টলের কাউন্টারে চলে আসা।

ক্যাশ মেমো করিয়ে বলে, 'দিন। বইগুলো প্যাকেটে ভরে দিন।'

বিক্রেতা অবাক, 'মানে? টাকা? পেমেন্ট?'

ক্রেতা বা তস্কর যেন আরও অবাক, 'টাকা! বলেন কী? এই তো দু'টো পাঁচশো টাকার নোট দিলাম। আপনি ব্যালান্স ফেরত দিন।'

বুঝুন অবস্থা! কাউন্টারের সামনে ক্রেতাদের লাইন। ওর পিছনে প্রায় জনাকুড়ি ক্রেতা বই হাতে দাঁড়িয়ে। অপেক্ষা করতে করতে তাঁরা বিরক্ত হচ্ছেন। লেগে গেল ব্যাপক ঝামেলা। এ বলছে, 'আপনি এক পয়সাও দেননি', অন্যপক্ষ বলছে, 'আপনারা তো চোর মশাই। আমাদের হ্যারাস করছেন, অপমান করছেন।'

অনেক সময়েই বেচারি বিক্রেতা ঝামেলা এড়াতে টাকা ফেরত দিয়ে দেন। বইও গেল, গ্যাঁট থেকে টাকাও গেল!

বছর তিনেক আগে আরেক দল বইচোরকে ধরা গেল, যাদের পকেটে 'PAID' সিল!

বড় সড় স্টলে এক জায়গায় ক্যাশ মেমো, এক জায়গায় ক্যাশ, তারপরে ডেলিভারির ব্যবস্থা—কী ইনোভেটিভ আইডিয়া! ক্যাশ মেমো করিয়ে, নিজেরাই ওই 'PAID' সিল মেরে চলে যেত স্টলের বই ডেলিভারির জায়গায়। দিব্যি ক্যাশহীন ক্যাশ মেমো নিয়ে, বই প্যাকেটে ভরিয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে আসত স্টল থেকে।

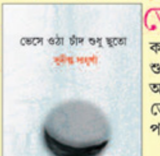
তবে এরা কিন্তু কেউই পড়ুয়া 'বইচোর' নয়। ভাল-ভাল, দামি বই নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে টাকা পকেটে পোরা এদের ধান্দা।

কুমার রায়
শম্ভু মিত্র
নির্মাণ ও সৃজন
১৫০



শম্ভু মিত্রের নাটক, নির্মাণ এবং তাঁর অবিস্মরণীয় নাটকগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন কুমার রায়। বহুরূপীর নাটক এবং শম্ভু মিত্রের সৃজনশীল জগতের বিভিন্ন দিক নিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে নির্মিত হয়েছে এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি। বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবেই বইটির স্বীকৃতি রয়েছে।

তরুণ কবি সুদীপ্ত সাধুখাঁ-র নতুন কাব্যগ্রন্থ
ভেসে ওঠা চাঁদ শুধু ছুতো



কবি সুদীপ্ত সাধুখাঁ-র নতুন কাব্যগ্রন্থ 'ভেসে ওঠা চাঁদ শুধু ছুতো'-য় রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত 'প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ-অনুভূতির কথা। সব ভালোবাসার গভীরেই তো বয়ে যায় অন্য আরও এক দুঃখময় নদী, না পাওয়ার বেদনা থেকেই সেখানে প্রতিনিয়ত জন্ম নেয় কবিতা। সে কবিতার কাছেই ঋণী থাকতে হয় আজীবন। ১০০



এই বই থেকে ৪০টি বাছাই কবিতার আবৃত্তি করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়। আবৃত্তির CD টি এই বইটির সঙ্গে বিনামূল্যে উপহার স্বরূপ দেওয়া হবে।

এবছর কৃত্তিবাস পুরস্কারে সম্মানিত বিহানরাতের বন্দিশ কাব্যগ্রন্থের জন্য
কবি বল্লরী সেন-কে
আমাদের অভিনন্দন



কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশক হিসেবে আমরা গর্বিত।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় নতুন উপন্যাস
নুনিয়া ব্রিজে ভোরবেলা



মূলত এই উপন্যাসে একাধারে জামালউদ্দিন রুমির সুফি সাধনার গান এবং বাংলার বাউল- ভাটিয়ালি-ফকিরি আর গম্ভীরার সুর যা প্রতিটি মানুষের হৃদয়পুরে বয়ে চলে, কান পাতলে যার ছলাৎধ্বনি পাওয়া যায়। ১০০

কবিতা
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
বয়সের ছাপ মুছে ফেলি বল্কলে
৮০



যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী সাহিত্য
লেখনী
১৫০



কবিতা, ছোটোগল্প এবং প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলনের অন্যতম উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালিদের সংগঠন 'লেখনী'র সদস্যদের শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসকে বাঁধিয়ে রাখা, যাতে হারিয়ে না যায়—যাতে তাঁদের লেখা লিপিবদ্ধ থাকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
চিলেকোঠার সেপাই
২০০





১০০

রেবা মুহুরী
ঠুম্‌রী ও বাঈজী

কুমার রায়
রবীন্দ্রনাটক
রূপ এবং রূপের ভাষ্য



আডেলবার্ট ফন শামিসো
ছায়াবিহীন
৬০



ভাষাবদল
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

শৈলেশ্বর ঘোষ
রাগপ্রধান গানগুলি
৮০



৬০



সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ডায়েরি

৩৫ বছরের এমন ডায়েরি বাঙালি লেখকদের মধ্যে আর কেউ লিখেছেন কিনা সন্দেহ। আনপ্রেডিক্টেবল। যা মনে করেছেন তাই লিখেছেন। গোটা বাংলা লেখালেখির জগৎকে ফালাফালা করেছেন। বাদ যায়নি নিজেও। ২৫০

রম্যরচনা
হিমাংশু তালুকদার
বঁড়শি-গাঁথা জীবন
২৫০



জলে মাছ, স্থলে মনুষ্য জীবন উভয়েই বঁড়শি-গাঁথা, বন্দিবদ্ধ। মনোমুগ্ধকর বাস্তব রম্যকাহিনি সম্পৃক্ত এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। ২০০

ছোটোগল্পের পর্ব-পর্বান্তর
সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য



ছোটোগল্পকারদের সাথে সমাজের সম্পর্ক দেখানো ছাড়াও আছে নান্দনিকতা, চিত্রকল্প, চিত্রাভাস, ভাষা-বিন্যাস। দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ছোটোগল্পকারদের নিয়ে এবং ছোটোগল্পে পরিবেশ-ভাবনা নিয়ে পর্ব থেকে পর্বান্তরে পৌঁছেছেন লেখক। ২৫০

২৫% ছাড়ে বই কিনুন

বইমেলার মাঠে আমাদের স্টল থেকে ৫০০ টাকার বেশি মূল্যের বই কিনলে দ্বিতীয়বার বই কেনার সময়ে সমমূল্যের বই ২৫ % ছাড়ে কিনতে পারবেন আমাদের প্রকাশনা অফিস থেকে।



২০০ টাকার বই কিনলে উপহার হিসেবে পাবেন সুদীপ্ত সাধুখাঁ-র স্বরচিত কবিতা পাঠের সিডি 'সঙ্গে যাওয়ার অসাবধানে'।

স্টল নং-২৮৭

প্রতিভাস ১৮এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-৭০০০০২, দূরভাষ ২৫৫৭-৮৬৫৯/৬৫৪৪৪৮৯৮
(বি.টি. রোডে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উলটোদিকে) ই-মেল prativash1986@rediffmail.com

ধর ধর বই চোর বই চোর

বিখ্যাত প্রকাশনা দে'জ-এর অন্যতম কর্ণধার হওয়ায় বইচুরির হরেক রকম দেখা আছে বই কী!

এক

বইমেলায় বইচুরি? মোস্ট ওয়েলকাম।

শুধু একটা ছোট্ট শর্ত আছে: যদি বই চুরি করতে গিয়ে চোর ধরা পড়ে, তাকে বইচুরি-র ওপর নির্ভুল বাংলা বা ইংরেজিতে একপাতার আর্টিক্‌ল লিখতে হবে। কেন সে বই চুরি করে, এ-ব্যাপারে স্পষ্টভাবে তার নিজের বক্তব্য জানাতে হবে। তা হলেই সাতখুন মাপ। আর্টিক্‌ল লেখো, জমা দাও, চুরির বই বগলদাবা করে বাড়ি চলে যাও। খেল খতম, পয়সা হজম।

বইচোর-দের শায়েস্তা করতে কয়েক বছর আগে 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড'-এর তরফে এমনই একটা নিয়ম করা হয়েছিল। এবং প্রকাশক হিসেবে এই মজার নিয়মটাকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলাম। সব দিক থেকেই এটা বেশ ভাল বন্দোবস্ত—মনে হয়েছিল আমার। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, আহা! কর্তৃপক্ষ কত সহৃদয় পদক্ষেপই না নিয়েছে, কোনও হুজ্জুতি নেই; অথচ ভেতরে ভেতরে ব্যাপারটার মধ্যে পুরোদস্তুর ভয়ের আবহাওয়া, গমগম করছে। অনেকটা পরীক্ষায় ফেল করার মতো। আর্টিক্‌ল লেখার এই আচমকা চ্যালেঞ্জ উতরোতে না-পারলে জনসমক্ষে আত্মসম্মান নিয়ে টানাটানির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। ভেবেছিলাম, এই নিয়ম প্রতি বছর বইমেলাতেই প্রযোজ্য হবে। সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি।

দুই

অনেক বইচোর দেখেছি। অনেক বইচোরকেই বামাল-সহ ধরেছি। হিসেব করলে, এখনও পর্যন্ত, হাফ-সেঞ্চুরি নিঃসন্দেহে হয়ে গিয়েছে। মনে আছে, জীবনের প্রথম বইচোর-কে পাকড়েছিলাম কলকাতা বইমেলায়, আমাদের স্টল-এ। তখন আমার বয়স তেরো-চোদ্দ হবে।

খুব ছোটবেলা থেকেই আমি বইমেলার স্টলে বসতাম। প্রথম-প্রথম আমার কাজ ছিল ক্যাশ মেমো-তে ডেলিভারি স্ট্যাম্প মারা। আস্তে আস্তে অন্য পোস্টে প্রোমোশন হয়। বইমেলায় আমাদের স্টলে কোথায় কী বই রাখা আছে সে-সব আমার মুখস্থ থাকত। লেখকের নাম বা বইয়ের নাম শোনামাত্র বলে দিতে পারতাম স্টলের কোন দিকে সেই বইটা সাজানো রয়েছে। লোকজন আশ্চর্য হয়ে যেত। অনেকে আবার বিশ্বাসই করত না যে, এতটুকু একটা ছেলে স্টলে বসতে পারে। কেউ কেউ ভাবত, আমি বুঝি কোনও অভিভাবকের সঙ্গে দে'জ-এর স্টলে বই দেখতে বা কিনতে এসেছি। বইচোরদের এই অনভিজ্ঞতা, এই দুর্বলতার জায়গাটাই আমি কাজে লাগাতাম। আমি যে 'ওয়াচম্যান' এই সন্দেহটা তারা করত না। তা ছাড়া, আমার ভেতরে কেমন একটা ইনস্টিংকট কাজ করত। যাকে দেখে একবার সন্দেহ হত এই লোকটা বই চুরি করতে পারে, তার পিছু ছাড়তাম না। অলক্ষ্যে নজর রেখেই চলতাম, এবং ঘটনাচক্রে দেখা যেত সেই লোকটা সত্যিই বইচোর।

তো, এমনই সন্দেহের বশে সেবার দু'টো ছেলেকে অনেকক্ষণ ধরে 'ফলো' করছি। তাদের বয়স আমার চেয়ে সামান্য বেশি। স্টলের এখানে-ওখানে গিয়ে তারা নানারকম বই উল্টেপাল্টে দেখছে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। একসময় একজন টুক করে একটা বই তার ঝোলায় ভরে নিল। যদ্দুর খেয়াল হচ্ছে, বইটা ছিল গায়ক সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান নিয়ে লেখা। অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনায় ছেলে দু'টো খেয়াল করেনি, আমি ওদের ঠিক পিছনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছি। অপারেশন সেরে তারা যেই-না স্টলের অন্যদিকে যাবে, আমি শান্ত স্বরে বললাম: দাদা, বইটা ফেরত দিন।

ওরা তো ঘাবড়ে গিয়েছে।

একজন তোতলাতে-তোতলাতে বলল, কোন বই?

আমি আরও ঠান্ডা গলায় বললাম, যে-বইটা এক্ষুনি ঝোলায় ভরেছেন।

এরপর বেচারা আর কী করে! কাঁচুমাচু মুখে বইটা বের করে দিল। আমি বইটা নিয়ে সোজা ক্যাশ মেমো করতে দিয়ে দিলাম। এটা একটা অলিখিত নিয়ম। বই চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে বইটা আপনাকে কিনতে হবে। পরে, এই নিয়মটাকে আমি আরেকটু কড়া করেছি। এখন বই চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে আপনাকে বই তো কিনতেই হবে, উপরন্তু কোনও ডিসকাউন্ট পাবেন না। যাই হোক, ক্যাশ মেমো করতে দেওয়া ছাড়া আমি কিন্তু সেবার বাড়তি কোনও হইচই করিনি। পাঁচজনকে জড়ো করে সালিশি বসাইনি। একবারও জিগ্যেস করিনি-ভাই, কেন বই চুরি করলে? আমার আচরণে চোর ছেলেটাও হয়তো একটু অবাক হয়েছিল। টাকা পেমেন্ট করে বই নিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে আলতো ভঙ্গিতে বলেছিল—সরি, এই লাইনে প্রথমবার তো, তাই!

আজও মাঝে-মাঝে কথাটা মনে পড়ে।

আরেকবার একজন ধোপদুরস্ত প্রৌঢ়কে ধরার পর যেই না বলতে যাব 'বইটা আপনাকে কিনতে হবে কিন্তু'—আমি কিছু বলার আগেই—তিনি বলেছিলেন, 'বইটা চট করে বিল করে দিন তো!' বিল মিটিয়ে তিনি হুড়মুড়িয়ে স্টল থেকে বেরিয়ে যান। স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না-করে, সেবারের বইমেলায় ওই ভদ্রলোককে আর আমাদের স্টলে দেখিনি।

তিন

প্রতি বছর বইমেলাতে যখন বই নিয়ে যাই, মেনে নিই যে, যত টাকার বই নিয়ে যাচ্ছি তার এক-দু'পার্সেন্ট ক্ষতি হবেই। মানে, কিছু বই চুরি যাবে। শত চেষ্টা করেও আটকাতে পারব না। আমি কেন, সব প্রকাশকই এই হিসেবটা মাথায় রাখেন। কিন্তু এরকম মানসিক প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও একবার মেজাজ সংবরণ করতে পারিনি। রাগে-হতাশায় বইচোরের গায়ে হাত তুলেছিলাম, যা আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

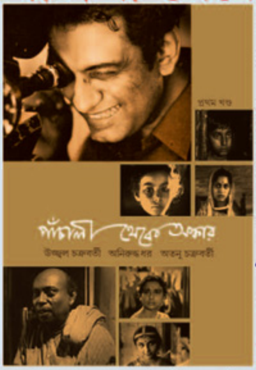
সে-বছর, পরে হিসেব করে দেখেছি, আমাদের স্টল থেকে প্রায় তিরিশ হাজার বই চুরি গিয়েছিল। এবং চুরির ঘটনাটা ধরা পড়ে বইমলোর শেষদিন, তাও মেলা শেষ হওয়ার ঘণ্টা চার-পাঁচেক আগে। একটি ছেলে একক প্রচেষ্টায় এই দুঃসাহসিক কাণ্ড ঘটিয়েছিল।

তার চুরির টেকনিক এত বুদ্ধিদীপ্ত, প্রশংসা না-করে পারা যায় না।

ভিড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে, বইমেলাতে সাধারণত একাধিক কাউন্টার খোলা হয়। স্টল থেকে বই কিনলে, সংলগ্ন কাউন্টারের স্টাফ সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশ মেমো করে দেবে। সেই ক্যাশ মেমো থাকবে আপনার কাছে, আর বই চলে আসবে মূল কাউন্টারে।

অনিরুদ্ধ ধর উজ্জ্বল চক্রবর্তী অতনু চক্রবর্তী কবীর চৌধুরীর অনুবাদে ৭টি বই

পাঁচালী থেকে অস্কার



এই বই স্পর্শ না-করে, উত্তরকালে বাঙালি মননের পথ চলা প্রায় অসম্ভব।

সত্যজিৎ রায়ের সম্পূর্ণ সৃষ্টি আলোচিত হয়েছে তিন খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই মহা-গ্রন্থে। সত্যজিতের ছবিতে নিরন্তর প্রতিফলিত হয় সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি ও দর্শনের বিবিধ নির্যাস। তাই শুধু চলচ্চিত্র-আলোচনাতেই সীমায়িত নয় এই বই; ছায়াছবির মোহিনী আবরণ ভেদ করে নিয়ত প্রবেশ করেছে মানব-জ্ঞানের নানা ধারায়— ভাষার ভ্রূণে, অর্থনীতির গণিতে, সংগীতের আসরে, ইতিহাসের প্রান্তরে। বৃহত্তর সেই অন্বেষাই বইটির উদ্দেশ্য। প্রাণকেন্দ্রে সত্যজিৎ রায়কে স্থাপন করে, বইটি বিস্তৃত এক আলোচনার আসর। চলচ্চিত্র ও মানব-জ্ঞানের ভবিষ্যৎ-অনুশীলনের মজবুত এক ভিত্তি রচনা করল এই গ্রন্থ। ৩৫০৲





জে. এম. কোয়েৎসির

অবিস্মরণীয় মাইকেল কে ১৫০৲

বর্বরদের অপেক্ষায় ১৬০৲





নাগিব মাহফুজের

আখেনাতেন : সত্যে বসবাসকারী ১২০৲

ওয়েডিং সঙ ১০০৲

গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের

প্রেম ও কলেরা ২৫০৲





আঁদ্রে মরোয়ার

The Art of Living-এর অনুবাদ

জীবনযাপনের শিল্পকলা



ট্রেসি শিভালিয়ার-এর ১৫০৲

গার্ল উইথ এ পার্ল ইয়াররিং ২০০৲

২৫% ছাড়ে বই কিনুন

বইমেলার মাঠে আমাদের স্টল থেকে ৫০০ টাকার বেশি মূল্যের বই কিনলে দ্বিতীয়বার বই কেনার সময়ে সমমূল্যের বই ২৫ % ছাড়ে কিনতে পারবেন আমাদের প্রকাশনা অফিস থেকে।



২০০ টাকার বই কিনলে উপহার হিসেবে পাবেন সুদীপ্ত সাধুখাঁ-র স্বরচিত কবিতা পাঠের সিডি 'সঙ্গে যাওয়ার অসাবধানে'।

স্টল নং-২৮৭



অর্ভিন ঘোষ-এর ৩টি জীবন-উপন্যাস ১টি ভ্রমণ কাহিনি

প্রজ্বলিত সূর্য স্বামী বিবেকানন্দ



বিবেকানন্দের প্রথমবার আমেরিকা ও ইউরোপ প্রবাসের ঘটনাবলি নিয়ে নির্মিত হয়েছে প্রজ্বলিত সূর্য স্বামী বিবেকানন্দ। তথ্য এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলেও সে সব ঐতিহাসিক তথ্যকে লেখক তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও দক্ষতা দিয়ে উপস্থাপন করেছেন উপন্যাসটিতে। শৈল্পিক উপস্থাপন উপন্যাসটির একটি অন্যতম দিক। ৩০০৲

নব বাল্মীকি রবীন্দ্রনাথ



ভারতীয় জীবনযাত্রায়, আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে রয়েছেন অঙ্গাঙ্গীভাবে। তাঁর সৃষ্টিজগতের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবন ঘিরে এখনও সীমাহীন কৌতূহল। রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনি অবলম্বনে তাঁর এই সৃষ্টিধর্মী লেখাটি বিদগ্ধ সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগের দেড় বছর রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণ করেন ইংল্যান্ড ও আমেরিকা। উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ের কথা। ২৫০৲

মহাত্মার জন্ম ৩০০৲

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পাঁচটি পর্বে ২৪টি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে গান্ধি-জীবন এবং তাঁর 'মহাত্মা' হয়ে ওঠার কাহিনি। উপন্যাসটিতে ছেলেবেলার কথা, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসা এবং আশ্রম স্থাপন পর্যন্ত সময়ের চিত্র নির্মাণে পরিশ্রমের ছাপ স্পষ্ট পাওয়া যায়। গবেষণা-নির্ভর উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করবে, আশা করা যায়।



মহাচিনে একমাস



পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে বেরিয়েছেন লেখক, সংগ্রহ করেছেন তাঁর সাহিত্যেরজন্য বিরল উপাদান। বিগত শতাব্দীতে চিন পরিভ্রমণে যান অর্ভিন ঘোষ। বলাবাহুল্য তাঁর এই যাত্রা ছিল নেহাত পর্যটকের মতো নয়, পরিব্রাজকের দৃষ্টি নিয়েই তাঁর যাবতীয় ভ্রমণ এবং চলাফেরা। চিন নিয়ে সাধারণ পাঠক এবং বুদ্ধিজীবী মহলে কৌতূহল ও উৎসাহ বরাবরই সামান্য বেশি। আমাদের এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রটিকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে রয়েছে পরস্পর-বিরোধী নানা মত। ২০০৲

প্রতিভাস ১৮এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-৭০০০০২, দূরভাষ ২৫৫৭-৮৬৫৯/৬৫৪৪৪৮৯৮
(বি.টি. রোডে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উলটোদিকে) ই-মেল prativash1986@rediffmail.com

এবার যখন আপনি মূল কাউন্টারে আসবেন, তখন ক্যাশ মেমো অনুযায়ী আপনার থেকে টাকা নেওয়া হবে এবং পাশের ডেলিভারি কাউন্টার থেকে আপনার কেনা বই আপনাকে বুঝিয়ে প্যাক করে দেওয়া হবে। বইচোর ছেলেটা করত কী—'ইন' লেখা দরজা দিয়ে স্টলে ঢুকে র‍্যান্ডম বই কিনত। আমাদের টেম্পোরারি কাউন্টারের স্টাফ সেইসব বইয়ের বিল করে দিত। বই চলে আসত মূল কাউন্টারে। ক্যাশ মেমো থাকত ছেলেটার হাতে। কিন্তু ছেলেটা ক্যাশ মেমো নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে আসত না। ও ক্যাশ মেমোগুলো পকেটে ভরে 'আউট' লেখা দরজা দিয়ে সোজা স্টলের বাইরে চলে যেত। আউট গেট-এ যে রক্ষী আছে, সে তাকে আটকাত না। কারণ ছেলেটার কাছে তো কোনও বই নেই। পকেটে ক্যাশ মেমো রয়েছে, কিন্তু পকেট সার্চ করার প্রশ্ন আসে না। এভাবে, একবার বাইরে যেতে পারলেই, কেল্লা ফতে। কীরকম?

না, বাইরে গিয়ে ছেলেটা ক্যাশ মেমোগুলোর ওপর দে'জ-এর নিজস্ব 'পেড' লেখা রবার স্ট্যাম্প-এর ছাপ মেরে নিত। কী করে জানি না আমাদের দোকানের হুবহু পেড স্ট্যাম্প ও জোগাড় করেছিল। তারপর পেড স্ট্যাম্প মেরে, ক্যাশ মেমোগুলো পকেটে ভরে সে 'ইন' গেট দিয়ে ফের আমাদের স্টলে ঢুকত এবং সোজাসুজি ডেলিভারি স্টলে গিয়ে বই চাইত। আমরা পেড লেখা ক্যাশ মেমো মিলিয়ে ওকে বই দিয়ে দিতাম। সংশয়ের অবকাশ কোথায়! এই ফন্দি করে ছেলেটা আমাদের প্রায় পথে বসিয়েছিল। রাতে হিসেব মেলাতে গিয়ে আমরা জেরবার। দেখছি যত টাকার বই বিক্রি হয়েছে, সে-পরিমাণ ক্যাশ আমাদের হাতে জমা পড়েনি। অথচ নিয়মে কোনও গরমিল নেই। কী করে হচ্ছে তবে চুরি?

যদি ছেলেটা আরেকটু মাথা ঠান্ডা রাখতে পারত, আমরা হয়তো এত বড় জোচ্চুরিটা কোনওদিন ধরতেই পারতাম না। এখানে বলে রাখি, ছেলেটা কিন্তু কোনও দিগ্‌গজ পড়ুয়া বা অর্থাভাব-পীড়িত বইপ্রেমী নয়। সে একজন সাদামাটা চোর। যে কোনও বই চুরি করে চোরাবাজারে বেচতে পারাটাই ওর চৌর্যবৃত্তির লক্ষ্য। বই ডেলিভারি নেওয়ার সময় ও প্রতিদিন একসঙ্গে পাঁচ-ছ'টা করে ক্যাশ মেমো নিয়ে আসত। প্রত্যেকটা ক্যাশ মেমো-তে আবার সাত-আটখানা করে বই। উদ্দেশ্য সহজ : একদানে যতগুলো সম্ভব বই হাতিয়ে নেওয়া। কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলো ক্যাশ মেমো যখন থাকে, তখন সব দোকানেই গ্র্যান্ড টোটাল-টা প্রথম পাতায় যোগ করে দেওয়া হয়।

সেবার বই ডেলিভারি দেওয়ার সময় আমাদের স্টাফ হঠাৎ দ্যাখে যে, একাধিক ক্যাশ মেমো থাকা সত্ত্বেও গ্র্যান্ড টোটাল-টা প্রথম ক্যাশ মেমো'তে যোগ করে দেওয়া হয়নি। কী ব্যাপার! এমন হওয়ার তো কথা নয়! তার মনে সন্দেহ হয়। ছেলেটাকে জিগ্যেস করে—'দাদা, আপনি যেন কত টাকা দিয়েছেন?' দেখা গেল, ছেলেটা যে উত্তর দিচ্ছে, তার সঙ্গে গ্র্যান্ড টোটাল মিলছে না। মানে গ্র্যান্ড টোটাল যদি বারোশো হয়, ছেলেটা বলেছে আমি হাজার টাকা দিয়েছি। কখনও বলছে, পনেরোশো দিয়েছি। অর্থাৎ, একেকবার একেক রকম কথা। সেটাই স্বাভাবিক। বইমেলা আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে—এই সময় একজন চোর কোমর বেঁধে বইচুরি করবে, না ক্যাশ মেমো-তে গ্র্যান্ড টোটালের হিসেব কষবে! ছেলেটার অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে আমাদের সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। সবাই মিলে ভালমতো জেরা-জিগ্যেস করতেই চুরির ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল। ওকে যখন হাত মুচড়ে গিল্ড-এর অফিসে নিয়ে যাচ্ছি, তখন ছেলেটা চেষ্টা করেছিল চুপিসাড়ে জামার ভেতর থেকে নকল রবার স্ট্যাম্প ফেলে দিতে। পারেনি। দিতে পারলে ওর ধারাবাহিক কুকীর্তি প্রমাণ করা কঠিন হত।

ছেলেটাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। কয়েকদিন শ্রীঘরেও ছিল।

কিন্তু টাকার গচ্চাটা আমাদের মেনে নিতে হয়।

এরকম গেরোয় যাতে আর না-পড়ি সেজন্য বইমেলাতে এখন নতুন নিয়ম চালু করেছি। 'পেড' লেখা নকল রবার স্ট্যাম্প দিয়ে এবার আমাদের ঠকানো মুশকিল।

চার

বইমেলাতে বইচুরির ঘটনা যখন বলছি, তখন চোরের ওপর বাটপাড়ির কিস্‌সাও বলা উচিত।

একবার একজন মাঝবয়সি বইচোরকে ধরেছি। জ্যাকেটের খাঁজ-ভাঁজ থেকে অনেকগুলো বই বেরল। প্রায় ছ'শো-সাতশো টাকা। আমরা বিল করে দিলাম। হঠাৎ মনে হল, দেখি তো লোকটার ব্যাগটা। যদি সেখানে কোনও বই থাকে! ব্যাগ খুলে আমার চোখ ছানাবড়া। আমাদের বই নেই বটে, তবে অন্য প্রকাশনার বই রয়েছে, ক্যাশ মেমো ছাড়াই। নতুন পদ্ধতি চালু করে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে। বইচোর লোকটাকে বললাম, আপনার যে-সব বইয়ের ক্যাশ মেমো নেই, সেই বইগুলো আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না। এগুলো আমার কাছে রইল। পরে, উপযুক্ত ক্যাশ মেমো দেখিয়ে বইগুলো নিয়ে যাবেন। যত দিন বইমেলা চলবে, দে'জ-এর স্টলে আমাকে পাবেন। কিন্তু বইমেলা পর্যন্তই এ সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ, বইগুলো যে আপনার তা প্রমাণ করার মেয়াদ বইমেলার শেষদিন অবধি। বইমেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর এলে হবে না। আর নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে যদি আপনি না-আসেন, তবে এই বইগুলোও আপনি আর ফেরত পাবেন না। বইগুলো আমার হয়ে যাবে।

এবং, হয়েও গিয়েছে। এইভাবে। বহু বই। অন্য প্রকাশনার।

চোরের ওপর বাটপাড়ি করে আমি পেয়েছি কখনও 'আনন্দ'-এর বই, কখনও 'মিত্র ও ঘোষ'-এর, কখনও-বা 'ইউবিএসপিডি'-র বই। কবে, কোন বছর, কোথাকার বইমেলা থেকে এই কায়দায় বই পেয়েছি—ঝাঁপু বইয়ের প্রথম পাতায় তা লিখেও রেখেছি।

প্লিজ, হাসবেন না।

পাঁচ

সেবার বইমেলা ময়দানে। প্রথম সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। হঠাৎ বিপত্তি। এক ভদ্রমহিলা কাউন্টারে বেজায় হল্লা-চেঁচামেচি করছেন। কী ব্যাপার? ওই মহিলার দাবি, তিনি তিনশো টাকার বই কিনে ক্যাশ কাউন্টারে পাঁচশো টাকা জমা দিয়েছেন। অথচ আমাদের স্টাফ তাঁকে ব্যালেন্স হিসেবে হকের দু'শো টাকা ফেরত দিচ্ছে না। দিচ্ছে না বইটাও। কেন? আমাদের স্টাফের বক্তব্য : ওই মহিলা দু'টো একশো টাকার নোট দিয়েছেন, একশো টাকা বাকি। ফলে, বই বা ব্যালেন্স কোনওটাই তাঁর প্রাপ্য নয়।

ঠেকে শিখেছি যে-এটাও বইচুরির একটা রকমফের। সুন্দরী, সুবেশা, স্মার্ট মহিলারা এই জালে প্রকাশকের গলা কাটেন। হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছি কী করব। ততক্ষণে ওই মহিলা, স্টলের ভেতরেই, সবার সামনে 'ঠগ'-'বদমাশ' বলে আমার শার্টের কলার চেপে ধরেছেন। না পারছি ওঁকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে, না পারছি বলপ্রয়োগ করে চুপ করাতে। শেষে বাবার কাছে নিয়ে গেলাম। বাবা তখন গিল্ডের অফিসে। নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই মহিলা ফেটে পড়লেন আমাদের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সব শুনে-টুনে বাবা বলল : আপনি কী চান? টাকা, না বই? দু'টো কিন্তু একসঙ্গে পাবেন না। ভদ্রমহিলা সটান বললেন : টাকা ফেরত চাই। অগত্যা তাঁকে দু'শো টাকা ফেরত দেওয়া হল। বইটা বাঁচাতে পারায় ক্ষতির বহর খানিকটা কমে। তখন থেকে নিয়ম হয়ে গেল : বইচোর যদি টাকা ও বই দু'টোই দাবি করে, সেক্ষেত্রে তাকে শুধু টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

ছয়

বইচোর-রা শুধু বইমেলা দাপিয়ে বেড়ায়— এ-কথা ঠিক না। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়াতেও অসংখ্য বইচোর ঘুরে বেড়ায়।



একটি মেয়ে, কলেজ বা ইউনিভার্সিটি-তে পড়ে, আমাদের দোকানে একসময় নিয়মিত আসত। বই নেড়েঘেঁটে দেখত। কিনত। আর দেখাশুনো, কেনাকাটার ফাঁকে-ফাঁকে চুরিও করত। আমাদের একজন স্টাফের মনে এই সন্দেহটা দেখা দেয়। তারপর মেয়েটির ওপর হাল্কাভাবে নজর রাখত সে।

একদিন আমাদের দোকানের ভেতরে ঢুকে অনেকক্ষণ বই-টই দেখার পর মেয়েটা একখানা বই 'বিল' করতে দিল। আমাদের কর্মচারীটি বিল করে দিয়েছে। তারপর সে মৃদু স্বরে বলেছে, ম্যাডাম, আপনার ব্যাগ থেকে বাকি দু'টো বই বের করে দিলে ভাল হয়, কারণ ওই দু'টো বইয়েরও বিল করতে হবে। এ-কথা শুনে মেয়েটা তো চটে লাল। 'কী বলছেন আপনি, আমি চোর?' 'মেয়েদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখেননি?' হ্যানত্যান অনেক কিছু বলতে-বলতে সোজা দোকানের ভেতরে বাবার টেবিলে গিয়ে হাজির। বাবার কাছেও একঝুড়ি অভিযোগ : 'দেখুন কাকু, আপনার স্টাফ আমার সঙ্গে কীরকম দুর্ব্যবহার করছে। বলছে, আমি নাকি বই চুরি করেছি!' বাবা তখন বলল, 'সত্যি এ তো ভারি অন্যায়। তবে দেখতে যখন চাইছে, ব্যাগটা খুলে একবার দেখিয়ে দিলেই হয়।'

বাবার মুখে এরকম স্মার্ট উত্তর মেয়েটা আশা করেনি। সে তৎক্ষণাৎ দোকান থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেল। স্টাফরা সবাই বেকুব। মেয়েদের ব্যাগে হাত দেবে কী করে? জোর করে আটকানোও মুশকিল। তবু সবাই মেয়েটার পিছনে-পিছনে ধাওয়া করল। কফি হাউসের সামনে তাকে ধরা গেল। কিন্তু মেয়েটার এক বুলি। সে বইচোর নয়, অতএব তার ব্যাগ সে দেখতে দেবে না। কর্মচারীরাও নাছোড়। শেষে রাগের মাথায় মেয়েটা শর্ত আরোপ করল, তার ব্যাগ সে দেখাতে পারে যদি কোনও মহিলা তল্লাশি করে তবে। এবং এই কথাটা বলেই নিজের বিপদ ডেকে আনল। কারণ, আমাদের বাড়ি তো দোকানের সঙ্গেই। আমার ধারণা, মেয়েটার এ-তথ্য জানা ছিল না। কর্মচারীরা অবশ্য তার প্রস্তাব শুনে উৎফুল্ল। বলল, ঠিক আছে ম্যাডাম। তাই হবে। আপনার ব্যাগ মহিলারাই দেখবেন। এরপর তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হল। আমার মা ওই মেয়েটার ব্যাগ থেকে আরও তিনটে (দু'টোও হতে পারে, মনে নেই ঠিক) বই বের করেন, যেগুলোর বিল হয়নি। মেয়েটা খুব লজ্জায় পড়েছিল। আর কখনও তাকে আমাদের দোকানে দেখিনি।

অর্থাৎ বলতে চাইছি—বইচোর নারী না-হয়ে পুরুষ হলে, আমাদের হ্যাঙ্গাম কম হয়। একবার যেমন এক ভদ্রলোক বই চুরি করেছেন। কিন্তু চুরিটা 'সফল' হয়নি। একজন কর্মচারীর সন্দেহ হয়। তখন সেই ভদ্রলোক উপায় না দেখে বই-সমেত সোজা বাথরুমে গিয়ে খিল তোলেন। তিনি ভেবেছিলেন, কিছুক্ষণ বাথরুমে থাকলে হয়তো বিপদ থেকে রেহাই মিলবে। ভুল ধারণা। একটু বাদে বাইরে এসে দেখেন, আমার দোকানের কর্মচারীটি তাঁর জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। তখন একেবারে নিরুপায় হয়ে ভদ্রলোক বইটাকে বাথরুমের ভেতরেই জলাঞ্জলি দেন। ভেবেছিলেন, এতে হয়তো রাহু কাটল। এটাও ভুল ধারণা। অতন্দ্র কর্মচারী সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোককে বলেন : আরে মশাই করলেন কী? বইটা কুড়িয়ে আনুন, নইলে বিল-টা করব কী করে?

সাত

মাস দুয়েক আগের ঘটনা। কলেজ পড়ুয়া দু'জন বইচোর-কে ধরেছি। থুড়ি, ধরেছিলাম আসলে একজনকে। যে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। জেরার মুখে সে স্বীকার করল, তার সঙ্গীও একটা বই চুরি করেছে। কোথায় সেই সঙ্গী? বোঝা গেল, হাওয়া গরম দেখে সে পিঠটান দিয়েছে। ঝগড়াঝাটি না করেও এই ধরনের পরিস্থিতি কী করে সামলাতে হয়, এতদিনে সেই অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে। ঠান্ডা মাথায় ছেলেটাকে বললাম, তোমাকে বইটা কিনতে হবে। সে বলল, টাকা নেই। এটাই যে বলবে, জানতাম।



ওকে এবার বললাম, তা হলে বন্ধুকে ডাকো। দ্যাখো, দু'জনে মিলে যদি কেনা সম্ভব হয়। ফার্স্ট ইয়ারের বইচোর ফোন করে তার বন্ধুকে ডাকল। বন্ধুটি তুলনায় বড়, থার্ড ইয়ারে পড়ে। অভিজ্ঞতাতেও কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধ। সে প্রথমেই আমার সঙ্গে তর্ক জুড়ল। তার প্রতিপাদ্য : সে বই চুরি করেনি। তখন আমি প্রয়োগ করলাম ব্রহ্মাস্ত্র। বললাম : হতে পারে। হয়তো তুমিই ঠিক বলছ। কিন্তু তুমি যদি ঠিক বলো, তা হলে তোমার বন্ধু ভুল বলছে। মানে, ও নিজে ফেঁসেছে বলে তোমাকেও 'কেস' খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। আর যদি তোমার বন্ধু ঠিক বলে, তবে তুমি মিথ্যে বলছ। ভাল করে ভেবে দ্যাখো, তোমাদের মধ্যে কে ঠিক বলছে।

ভেবেছিলাম, ওরা নিজেদের মধ্যে কাজিয়া শুরু করবে।

কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, এরকম কঠিন পরিস্থিতিতেও ছেলে দু'টির পারস্পরিক নির্ভরতা টোল খেল না। ওরা সত্যিকারের ভাল বন্ধু। কেউই চায় না, তার জন্য বন্ধুর অসম্মান হয়। শেষে থার্ড ইয়ারের ছেলেটি স্বীকার করল যে, সে বই চুরি করেছে। বইটা বনসাই-চর্চা সংক্রান্ত। কেন চুরি করেছ? উত্তরে জানাল, এই বইটা সে বাবাকে উপহার দেওয়ার জন্য চুরি করেছিল। পকেটে যথেষ্ট টাকা থাকলে চুরি করত না, কিনেই বাবাকে দিত।

সব জেনে, সব শুনে আমি সেদিন একটু আবেগপ্রবণ হয়ে



পড়েছিলাম।

আজ আমাদের প্রকাশনা যে-স্তরে উন্নীত হয়েছে, আমাদের ব্যবসার পরিধি যত দূর সম্প্রসারিত হয়েছে—সেই সাফল্য কিন্তু একদিনে আসেনি। এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে কঠিন আর্থিক যুদ্ধ, হার-না-মানা জেদ এবং সদিচ্ছা। আমি সেই ইতিহাস জানি। 'পকেটে টাকা থাকলে বনসাই-এর বইটা কিনেই বাবাকে দিতাম' এটা শোনার পর আমি ছেলে দু'টোকে প্রতিশ্রুতি দিই যে, ভবিষ্যতে কোনও বই পড়তে বা কিনতে হলে তারা যেন চুরির পথে না হাঁটে। যেন আমাকে এসে একবার বলে। ওদের ইচ্ছে কতটা মেটাতে পারব জানি না, তবে একটা চেষ্টা করে দেখব।

বই চুরি করে ধরা পড়েও, ছেলে দু'টো সেদিন হাসতে-হাসতে ফিরে গিয়েছিল।

ওদের স্বপ্নময় মুখ আমি অনেকদিন ভুলতে পারব না।

আট

কেন লোকজন বই চুরি করে?

কারণটা আমার কাছে আজও স্পষ্ট নয়। হয়তো মজা পায় বলে, হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে বাজি লড়েছিল বলে, হয়তো সত্যিই টাকা ছিল না কিন্তু বইটার দরকার ছিল। হয়তো, এটা একটা মানসিক নেশা। জানি না সত্যি কী জন্য বইচোর বই চুরি করে। তবে অন্যান্য চুরির থেকে বই চুরির একটা আলাদা মর্যাদা রয়েছে। চোরকে ধরতে পারলে প্রথমে রাগ হয়। পরে, সেই রাগ পড়েও যায়। একবার যেমন, একজন বন্ধুর মারফত একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। কিছুক্ষণ কথা বলার পর নতুন ছেলেটি জানাল : তোর দোকান থেকে কত বই যে ঝেড়েছি, তুই জানিস না! চুরির কথা স্বয়ং মালিককে কেউ যে এমন বুক বাজিয়ে বলতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। শুনে প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। অথচ ছেলেটার ওপর রাগ করতে পারিনি। দিব্যি হাসি-ঠাট্টা করে বাকিটা সময় কাটিয়েছিলাম।

কেন রাগ করতে পারিনি? শক্ত-শক্ত দু'চার কথা কেন সেদিন বলতে পারিনি? বহুবার নিজের মনে-মনে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে—তুমি যত বড় ব্যাটসম্যান-ই হও, শূন্য রানে তোমাকেও একদিন আউট হতে হবে। আমি হয়তো বইচোর ধরার ম্যাচে হাফ-সেঞ্চুরি করেছি, কিন্তু এমনও তো দিন গিয়েছে যেদিন একটাও রান পাইনি, আমার উপস্থিতিতে আমার দোকান বা স্টল থেকে বইচোর কাজ সেরে সটকে পড়েছে।

এটাই আমাদের জীবন, আমাদের বেঁচে থাকা।

এখন, নিজের বেঁচে থাকার ওপর কত আর রাগ করা যায়!

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বইচোর ▲ সুস্নাত চৌধুরী

Take, নিক

বই চুরির প্যাঁচ, পয়জার, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, এক্সট্রা।

বইচোরদের যেমন জীবনানন্দ আছেন, তেমনই সুনীল-শক্তি-সন্দীপনের কৃত্তিবাস গোষ্ঠীও আছে। কেউ একা, ম্লান মুখে, চাল-ধোওয়া-হাতে আলতো করে সরিয়ে নেন। নিতে থাকেন। কারও আবার দলগত প্রয়াস। তাঁরা টিম স্পিরিটে বাজি রেখে খেলেন। কৃত্তিবাসীদের অবশ্য টিম আর স্পিরিট দু'টোই ছিল অনিবার্য, এক্ষেত্রে স্পিরিট তত জরুরি নয়! কারণ, আদপে এঁরা কৃত্তিবাস নন, বরং তাঁর পূর্বপুরুষ বাল্মিকীর ভাবশিষ্য। রত্নাকরের ফ্যাকসিমিলি।

এই মেটামরফোসিস-ই বইচুরির ইউএসপি। অর্থাৎ, সে শুধু তাক থেকে পাড়ে না, তাক লাগিয়ে পড়েও! এ ধারণাই বইচুরির কভারে লিখে রাখে মহত্ত্বের ব্লার্ব। বইচোরের কাজটাও সহজ হয়ে যায়। শুনেছি, বছর পঁচিশ-ত্রিশ আগে নাকি ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে একের পর এক বইয়ের পাতা কাটা যাচ্ছিল। উদ্বিগ্ন কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি যোগাযোগ করে আমেরিকান লাইব্রেরির সঙ্গে। তারাও বেমালুম জানিয়ে দেয় : বেশ তো, এ তো ভাল লক্ষণ, তার মানে মানুষ পড়ছে! এসব গুজব হতে পারে, কিন্তু ভারতের প্রতি আমেরিকার এমন বই-মাত্রেয় আচরণের কাহিনি বইচোরদের মনোবল বাড়ায়। কারণ, যে কোনও চুরির সময় বুক টিপ-টিপ করলে, গলা শুকিয়ে গেলে কেলো! পা ঠক-ঠক করলেই নিজেকে পাঠক ভাবুন। হারানো কনফিডেন্স ফিরে আসবে। বইচুরির টেকনিক-এ এটাই সহজ পাঠ।



ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বইচুরির সিলেবাসে নানা রুট, নানা রুটিন। কেমন বই, কোথায় রয়েছে, কখন চুরি করছি—এসবের নিবিড় জ্ঞান কুশলী বইচোরের থাকা মাস্ট।

বইকুণ্ঠ

বইচুরির স্বর্গ বইমেলা। এত ধুলো, চোখে দেওয়ার জন্য কখনও কম পড়ে না!

মরশুমি চোরের ফি-বছর বইমেলাই ঢের। অন্যথায় ভিজিট বই-এর দোকানে। অবশ্য হরদম বই-ঠক বৈ ন বৈ ন চ!

অপশন থ্রি, গ্রন্থাগার। নিয়মিত লাইব্রেরিয়ান যেখানে বই ঝাড়েন, তাক সাফ করেন। আপনিও সেই পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বই ঝাড়ুন, তাক সাফ করে দিন!

আর আছে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই। মার্ক টোয়েন-এর মতো আপনার ঘরের মেঝেও উপচে পড়ুক সেসব বৈশ্বর্যে। সত্যিই তো, পরিচিতের বই যেভাবে হাতানো যায়, বইয়ের তাক কি সেভাবে বাগানো সম্ভব!

বই কাল

বিকেলের দিকে লাইব্রেরি থেকে বই ঝাড়া মুশকিল। তখন মেলা লোক। অবশ্য ওস্তাদ আদমিরা সেই ভিড়কে কাজে লাগিয়েই কাজ হাসিল করেন। আম-বইচোরদের জন্য লাইব্রেরিতে দুপুরের দিকটা শ্রেয়। চারিদিক ফাঁকা, মুখে এক খিলি পান দিয়ে লাইব্রেরিয়ান যখন একটু ঝিমোচ্ছেন। অথবা বর্ষার সন্ধে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গ্রন্থাগারিক অল্পবয়সি হলে একটু আনমনা, বয়স্ক হলে বেরনোর জন্য একই সঙ্গে দুশ্চিন্তা আর তাড়া...। ব্যস, শুধু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার! লাইব্রেরিতে সরস্বতী পুজোর গল্প থাকলে, তার আগের রাতটিও বইচুরির হাতেখড়ির জন্য আদর্শ। থিয়োরিটিকালি, প্র্যাকটিকালি-ও!

আর বইমেলায় অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে ভরসন্ধের ভরা 'বাজার'। অথবা, রাত্তিরের স্টল বন্ধের হুড়োহুড়ির সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ওয়েটে ওয়েট বাড়ে ব্যাগের।

কিংবা তক্কে-তক্কে থাকুন, লিটল ম্যাগাজিনের টেবিলে বা স্টলে দাঁড়িয়ে একথা-সেকথায় সময় কাটান, লক্ষ রাখুন বিক্রেতার অবাধ্য মোবাইলটি কখন বেজে ওঠে। তিনি মোবাইল কানে অবধারিত পায়চারি লাগালে, আপনিও বই হাতে মোবাইল হয়ে যান। অথবা বিক্রেতার চোখ নীচে, এসএমএস-এ আপনি ফেড আউট হতে থাকুন। স্লোওলি...।

সিপিএম মঙ্গল করুন, বইমেলায় যেন আগুন আর না লাগে। লাগলে, কারও সর্বনাশের মধ্যেই আপনার বেসিক ইনস্টিঙ্কট পৌষমাসের খোঁজ করতে পারে!

বই তরণী

বইবেন কীসে? বইমেলার অন্য কোনও পাবলিশার-এর ক্যাশমেমো, বই-সমেত প্যাকেটে হাতে রাখতে পারেন। সুচারু হাতে সেখানেই চালান করে দিন একটি কি দু'টি বই। বইবার পরিমাণ বেশি হলে বাংলা আকাদেমি ছাপ-মারা লিটল ম্যাগাজিন মেলার বিগ শপার একখানা জোগাড় করুন। চোরসত্তাকে ছাপিয়ে

আপনি তখন আঁতেলতর। ঢোলা চাদর বা ফোলা জ্যাকেটের বেশও বেশ কার্যকরী। এক পলক ইতিউতি দেখে ট্যাকে গুঁজে নিন। বিদেশের বইচোরেরা পরার ওভারকোটটিও কাস্টমাইজ করে নেন। বেশ কিছু চোরাপকেট থাকে কোটগুলিতে। তবে, সেন্ট পিটার্সবার্গের রাশিয়ান ইম্পিরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরির জার্মান লাইব্রেরিয়ান ডক্টর এলয়েস পিচলার ছিলেন এ ব্যাপারে সিদ্ধপুরুষ। ১৮৭১ সালে চার হাজারটি বইচুরির দায়ে তাঁকে পাকড়াও করে পুলিশ। কোর্টেই ফাঁস হয় কোটের কথা। পিচলারের পরার ঢাউস কোটগুলি ছিল সত্যিই অদ্ভুত, সেগুলির ভেতরে জোড়া থাকত গোটা একটা করে ব্যাগ-ই! ব্যাগিস জামার কী মহিমা!

আমাদের দেশি চাদরের আদরও কম ছিল না। মহিলা বইচোরদের প্রধান হাতিয়ার। তবে, বহু লাইব্রেরিতে ইদানীং চাদর নিয়ে ঢোকাই মানা। এটাও ঠিক, শীতকাল ছাড়া চাদর রাখলে সন্দেহ হবেই। বছরভর আপনার আর্তনাদই সার, শীতকাল কবে আসবে...? সুপর্ণা স্পিকটি নট! কিন্তু আঁচলের বেলা? সারা বছরই বঙ্গজীবনের অঙ্গ। লম্বা-ভারী আঁচলে জাপটে নিয়ে কানন দেবী-সুলভ খনা রেকর্ডিং-এ আপনি গাইতেই পারেন, আঁচল পে তুঝে ম্যায় লেকে চলু...। রাজ্যের প্রায় সব লাইব্রেরির দারোয়ানই পুরুষ, আপনি বঙ্গনারী, অগত্যা শাড়ির আঁচল তুলবে সে কি এমনি শক্তিমান?

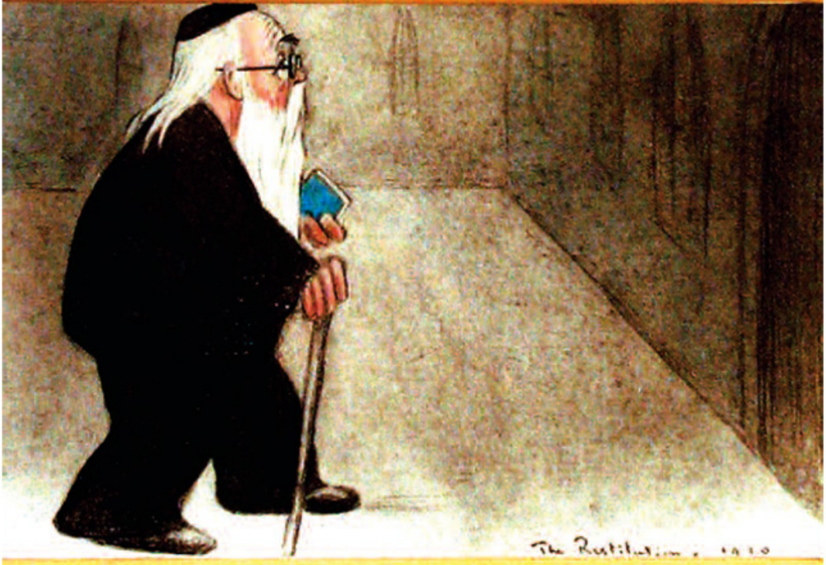
আর আছে টুপি। খাটো সিরিজের দু-এক ফর্মার বই অনায়াসে মাথায় করে রাখুন। কোনও ভয় নেই, শুধু ভুলেও কারও কাছে মাথা নত করবেন না। অবশ্য বারংবার অনেক লাইব্রেরিই হালফিল নিষেধাজ্ঞা বসিয়েছে টুপিতে। এই কলকাতার আমেরিকান লাইব্রেরিতেই নাকি টুপি পরে ঢোকার বিস্তর হ্যাপা।

বই দিক পাল

বইচুরি গুপ্তবিদ্যা। তার বেদও শ্রুতি। তাই দিকপাল হওয়া বড় কঠিন কাজ। একেবারে কপি-বুক খেলে বুক কপি করতে আর ক'জন পারে? ব্রেঁসো-র 'পিক পকেট' যেমন পকেটমারদের মেড ইজি, তেমন সাইকোলজিকাল রিয়ালিজম কি আর বইচোরদের কপালে জোটে? আছে হয়তো এন চৌধুরী-মার্কা বইচুরির টেকনিক বাতলানো রেফারেন্স। তবে, ওই দু-এক পিসই। না, বই চুরি করে লেখা মানে-বইয়ের কথা বলছি না, বইচুরির মানে-বই বলছি। যেমন, সল বেলো-র অগি মার্চ। কাল্পনিক এই চরিত্রটিকে তার বন্ধুই শিখিয়ে দিচ্ছে বই চুরির অ আ ক খ। অ্যাবি হফম্যান-এর 'স্টিল দিস বুক' অবশ্য একটু অন্য বিষয়ে। আইনি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর টোটকা। সরকারি বা কর্পোরেট মালিকানার বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদের নির্দেশিকা। টিপিকাল ফ্যাতাড়ু-সুলভ এই স্টান্সে বইচুরিও কি একটা চ্যাপটার নয়?

আর কিছু মানুষ আছেন, বইচুরির দুনিয়ায় যাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবেই লিভিং লেজেন্ড। নিজেরাই এক-একটা এনসাইক্লোপিডিয়া। যেমন আশ্চর্য তাঁদের সাধনা, তেমনই ঈর্ষণীয় তাঁদের সংগ্রহ! স্টিফেন ক্যারি ব্লুমবার্গ। বছর কুড়ি ধরে চৌর্যবৃত্তি চালানোর পরে ১৯৯০ সালে ধরা পড়েন একচল্লিশ বছরের ব্লুমবার্গ। পঁয়তাল্লিশটি রাজ্যের তিনশো সাতাশটি লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম ঘেঁটে তাঁর চুরি করা বইয়ের সংখ্যা ততদিনে আঠারো হাজার ন'শো! বইচুরির জন্য বাজি রেখেছিলেন গোটা জীবনটাই। বিয়ে করেননি, ঘুমোতেনও না একটানা, নিজের পুরনো ক্যাডিলাক-এ চেপে ঘুরে বেড়াতেন দিনভর। কখনও ভাড়া করতেন আস্ত একটা ট্রাক। আইওয়া-তে তাঁর সতেরো কামরার বাড়ি ঠাসা ছিল বইয়ে। 'কৌশল' দিয়ে হয় না, এখানেই প্রয়োজন 'সাধনা'!


Then - 1894



ছিলেন ভয়ঙ্কর বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণ। পাকা বইচোর হওয়ার যা অন্যতম শর্ত। আর ছিল ফিজিকাল ফিটনেস। কখনও লুকিয়ে পড়তেন, কখনও ছিটকে বেরিয়ে যেতেন, কখনও দশ আঙুলে ম্যাজিক দেখাতেন। কেউ দেখতেই পেত না, ব্লুমবার্গ নিজেই শিউরে উঠতেন নিজের ম্যাজিকে।

তাঁর চুরির একটা বড় অংশ ছিল পরিচয় বদল করে। হার্ভার্ড লাইব্রেরিতে গিয়ে তিনি হয়ে যান ম্যাথু ম্যাকগিউ। তিন মাসের পাস জোগাড় করেন, তাতেই কেল্লা ফতে! হার্ভার্ড হা-ঘরে! জো অর্টন, ডেভিড শিম—এঁরাও এমন সব কিংবদন্তি মহাপুরুষ।

বুক কেস

বইচুরির গ্রেট মাস্টারদের মতো ছিঁচকেদের মধ্যেও চমকানো কেস-কিস্‌সা কিছু কম নেই। ধুরন্ধর বইচোর সহজে বুক-কেস খান না! সে-ব্যাপারে স্বয়ং হিটলারকেও তাঁরা হিট-উইকেট করে দিতে পারেন। শোনা যায়, একবার হিটলারও নাকি বই চুরি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। জার্মানির এক লাইব্রেরিতে গিয়ে নিজের পছন্দের একটি পকেট-বই পেয়ে যান তিনি। সটান চালান করে দেন খাপে-খাপ পকেটে। লাইব্রেরিয়ানও পঞ্চুর বাপ! বুঝতে পেরেও টুঁ শব্দটি করেন না। করলে, বই ফেরত পেতেন, কিন্তু প্রাণটা দিতে হত। তিনি বুদ্ধি করে তড়িঘড়ি অ্যানাউন্স করেন, একখানি বই চুরি গিয়েছে, প্রত্যেকে যেন তাঁদের কোটটি নির্দিষ্ট একটি ঘরে খুলে রাখেন। বাধ্যত হিটলারকেও রাখতে হয়। অন্য দু-একটা কোট খোঁজার অভিনয়ের পর হিটলারের কোট থেকে বইটি বের করে নেন লাইব্রেরিয়ান। হা হিটলার!

সুতরাং, কুচো বইচোরেরও এলেম থাকতেই হবে। ইম্প্রোভাইজ করতে হবে। একা চুরি করতে গেলে হাবাগোবা সাজতে হবে, অন্যের অবজ্ঞাকে কাজে লাগাতে হবে। দল বেঁধে করতে গেলে কো-অর্ডিনেশন বাড়াতে হবে। কেউ ব্যস্ত রাখবে বিক্রেতাকে, দরকারে ব্যতিব্যস্ত করবে, খচিয়ে দেবে—অন্যরা সেই তালে হাতের কাজ সারবে—পাস করে দেবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক দলের হাতে। গ্রুপ থিয়েটার আর ফুটবল মাঠের স্ট্র্যাটেজি-র এ এক অনবদ্য ককটেল।

আবার শিক্ষক-অধ্যাপকদের সোজাপথ, স্কুল-কলেজ লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে এসে চেপে যাওয়া। স্রেফ, ভুলে যাওয়া। তারপর রিটায়ারমেন্ট পর্যন্ত মিউট। নীরবতা পালন। স্কুলের লাইব্রেরিয়ান কি আর জটায়ু যে লাফ দিয়ে বলবেন, 'এটা আমার'!

আরও একটা পথ আছে। আট আনা, দশ আনা, মায় পাঁচ-দশ টাকা দাম লেখা পুরনো রেয়ার কালেকশন তুললেন। তারপর একদিন স্মার্টলি বলে দিলেন, হারিয়ে ফেলেছেন। এবার? নিয়মমতো আপনাকেই বই-এর দাম পুষিয়ে দিতে হবে। দিন, অম্লানবদনে খুচরো তুলে দিন লাইব্রেরিয়ানের হাতে। বদলে, আউট অব প্রিন্ট বই-দুর্য তখন আপনার সিন্দুকে।

লাইব্রেরি থেকে বই সটকাতে আরও একটি পথ অনেকেই বেছে থাকেন। টাইটেল পেজের পিছনে মারা স্ট্যাম্পে অ্যাকসেশন নম্বরটি গাঢ় কালি বা মার্কার দিয়ে ঢেকে দেন। বইটি চিনতে, নিজেদের বলে প্রমাণ করতে ফাঁপরে পড়ে কর্তৃপক্ষ। চুপিচুপি বলি, বহু বইচোরই জানেন না বলে, এই কীর্তি করতে গিয়ে ধরাও পড়ে যান। কারণ, প্রতিটি বই-এর ওই ইউনিক নম্বরটি আখ্যাপত্রের পিছনে তো থাকে বটেই। থাকে ভিতরের আরও একটি পাতায়। যা খেয়ালই করেন না বইচোর। আর সেটাই হাতিয়ার হয়ে যায় লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের। এককেটি লাইব্রেরির ক্ষেত্রে এককে সিক্রেট পেজ-এ অ্যাকসেশন নম্বর ফের লেখা থাকে। পরের বার সিক্রেটটি ওপেন করে নেবেন ও পেন ঘষে নেবেন ঈষৎ!

লাইব্রেরি থেকে বইচুরির দু'টি মজার কাহিনি শুনেছিলাম। প্রথমটি সম্ভবত দেড়শো বছর পেরনো উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের। এককালে এখানে নিয়মিত আনাগোনা ছিল মধ্যবয়সি এক বইচোরের। তিনি করতেন কী, লুকিয়ে বই নিয়ে, বাথরুমের জানলা দিয়ে টুপ করে বাইরের ঝোপে ফেলে দিতেন। পরে ফেরার সময় কুড়িয়ে নিতেন। মোটিভ ছিল, বই বেচে মাল খাওয়া। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোনও রেয়ার আউট অফ প্রিন্ট বই তিনি কখনও বিক্রি করেননি! আরও মজার কথা, কর্তৃপক্ষ যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল, সেই ব্যক্তিকে নাকি কিচ্ছু বলা হয়নি। শুধু বাথরুমের জানলাগুলো জাল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল!

দুসরা। বেশি দিনের কথা নয়। কলকাতার লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র। এক মক্কেল নিয়মিতই সেখানে পত্রিকার পাতা কেটে পড়েন। তারপর কেটে পড়েন গোপনে। একদিন ধরাও পড়ে গেলেন বামাল। পরে, তাঁর হয়ে সাফাই গাইতে গিয়ে এক বন্ধু তুলে ধরলেন একটি বিজ্ঞাপনের ক্যাপশন। ওই লাইব্রেরিরই বিজ্ঞাপন। সেখানে স্পষ্ট হরফে লেখা, 'আধুনিক মন-মননের খিল খুলে/অবাধে প্রবেশ করুন/প্রকাশ্যে চুরি করুন/ অনন্ত পত্রিকা সম্ভার!'

চেক বুক, পাস বুক

সিসিটিভি-র জমানা। লাইব্রেরি হোক বা বইমেলা, বইচোরকে সর্বদা তটস্থ থাকতে হয়। বইচুরির আগেই ছকে রাখতে হয়, ধরা পড়লে, কেটে বেরনোর প্ল্যান। প্রথম টেকনিকই হল—ধরা পড়লে বুক বাজিয়ে নিজের পাণ্ডিত্য উজাড় করে দেওয়া। অর্থাৎ, যদি 'শাহাজাদা দারাশুকো' ঝাড়তে চান, তা হলে বাড়ি থেকে পড়ে আসুন 'কুবেরের বিষয়-আশয়'। যদি টার্গেট হয় 'প্রথম আলো' তা হলে প্রিপারেশন নিতে হবে 'সেই সময়'-এর। একটু-আধটু পড়াশোনা, বৌদ্ধিক দুনিয়া সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর জ্ঞান, আর অনন্ত বকুনি!

বইচুরির জন্য আবশ্যক, ঝড়ের বেগে লেখার অভ্যেস! কারণ বইমেলায় ধরা পড়লে কমন শাস্তি, আনকমন বই থেকে বড় একটা অংশ টোকা। হ্যাবিট না-থাকলে ঘোর বিপদ। ইস্কুলে টুকতে গিয়ে ধরা পড়েছেন, এবার ধরা পড়ে টুকতে হতে পারে বইকী!

তবে, শাস্তির বই-চিত্র ছিল মধ্যযুগের ইউরোপে। প্রস্তুতির বেশিটাই তখন মানসিক। সেসময় ধরা পড়লে নাকি ষাঁড়ের পিঠে চেপে নির্বাসনে যেতে হত (সঙ্গে কোনও বই না নিয়েই!), দেওয়া হত নানা ধরনের ভয়ঙ্কর অভিশাপ। সম্পর্ক ছিন্ন হত চার্চের সঙ্গে। প্রাচীন বইচোররা সেসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে গিয়েছিলেন। বইচুরির সংস্কৃতিও দিনকে দিন জোরদার হয়েছিল।

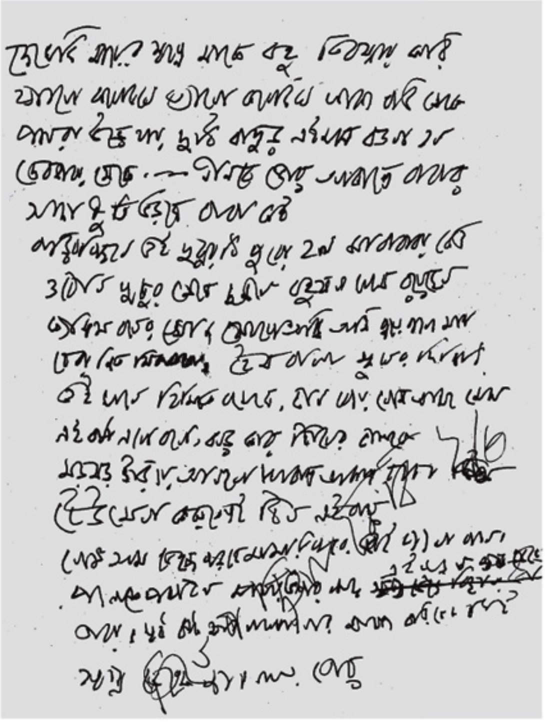
গ্রন্থ না

সব বইচোরই আসলে গল্পের সেই ম্যাজিশিয়ানের মতো। যাঁরা হাতের জাদুতে বইকে রুমাল করে দেন। তারপর আরামসে ভাঁজ করে পুরে নেন পকেটে। এসব কথা জানা যায় না। জানতে নেই। সব চোরকে তো আমরা চিনতেও পারি না। যখন লেখক বহু শ্রমের কপিরাইট ফেরত পান না, শুধু প্রকাশককে বিশ্বাস করেন বলে? হারিয়ে যায় মৃত কবির অপ্রকাশিত কবিতার ডায়েরিটা, তারপর প্রকাশিত হয় তাঁরই প্রাক্তন প্রেমিকার নামে? সরকারি নিষেধাজ্ঞার ফাঁস চেপে বসে লেখিকার কলমে? মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় পাগলা দাশু, বুড়ো আংলা? যখন বইমেলা থেকে বেরনো দম্পতির দু'হাতে শুধু ঝুলতে থাকে বিদেশি আলুভাজার ফোলানো প্যাকেট? তখন? ঢের হয়েছে, আপনি বরং এসব বইচুরির টেকনিক-ই এবার রপ্ত করুন। কারণ শত চেষ্টাতেও আপনি আজ পারবেন না 'ফারেনহাইট 451'-এর সেই বইচোর হতে, যাঁরা স্মৃতি দিয়ে চুরি করে নিতেন সমগ্র গ্রন্থ। নাকি নিজেরাই হয়ে উঠতেন এককেটা আস্ত বই। মুখস্থ বলে যেতেন বাক্য, শব্দ, যতিচিহ্ন। 'শোলোক বলা কাজলা দিদি'-ই বা কীভাবে চুরি হয়ে গেল, সে-উত্তর দেওয়ার মুরোদও আপনার নেই।

কেউ কবিতা লিখতে চায় কেন? ছাপানো বা নাম করার জন্য? এ প্রশ্নের উত্তরে তো কিছু বলার নেই। কিন্তু কখনও কবিতা লেখেনি এমন কেউ যখন হঠাৎ একটা কাগজ টেনে লিখতে শুরু করে দেয়, তার দু'টো কারণ অন্তত আমার ধারণায় আসে। এক, যে-কথাটা কাউকে, অন্য কোনওভাবে বলা যাচ্ছে না, সেই কথাটার ক্রমাগত তোলপাড় থেকে হঠাৎই লেখার শুরু। সে লেখা কবিতা-লেখার জন্য নয়। হয়তো ডায়রির মতো। হয়তো, চিঠির মতো। যে-চিঠি, প্রথম থেকেই সে জানে, ডাকে দেওয়া হবে না কোনওদিন। আর একটি কারণ হল, দিবারাত্র মাথায় স্রোতের মতো কথা আসছে। তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে কী করে! এই বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছ কোনও একটা বিষয় নিয়ে, কিংবা টিভিতে খেলা দেখছ, বা কর্মস্থলে ঢুকছ মাথায় কোনও কাজ নিয়ে—তার মধ্যে ঠিক ওই দ্বিতীয় স্রোত বয়ে যাচ্ছে ভেতরে। দ্বিতীয় স্রোত, অর্থাৎ অন্য কেউ কী যেন সব ঝড়ের মতো বলে চলেছে। অথবা এমনও হয় অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ নেই, কোথা থেকে যেন আবার হঠাৎ সেই দ্বিতীয় স্রোত চালু হয়ে গেল। বিরতির পর ওই আচমকা ফিরে আসাটা ঘটে সাধারণত বাথরুমে গেলে। প্রবল কাজ-ব্যস্ততা বা অযথা হুল্লোড়, এমনকী সিনেমা-নাটকের ইন্টারভ্যালে যেই গিয়ে ইউরিনালের সামনে দাঁড়ানো, অমনি কোথা থেকে সে হাজির। সেই দ্বিতীয় স্রোত। ওই যে ইউরিনালের সামনে দেওয়ালের মুখোমুখি দাঁড়াবার সূত্রে পাওয়া দু'মিনিটের বাধ্যতামূলক নির্জনতা, তার সুযোগ নিয়েই হানা দেবে সেই দ্বিতীয় স্রোত। কখনও তা হতে পারে পরপর চলে আসা তিন-চারটি কবিতার লাইন। কখনও বা দ্রুত নিক্ষিপ্ত একটি গদ্য প্যারাগ্রাফ। কখনও বা একটাই লাইন শুধু। গদ্যের বা কবিতার। মুশকিল এই যে, ওইসব স্বর্গচ্যুত পংক্তি বেশির ভাগ সময়েই আর লিখে রাখা হয় না। বা অনেক পরে লিখতে গিয়ে দেখা যায় বেশ খানিকটা হারিয়ে গিয়েছে। আর যা মনে পড়ছে তা খানিকটা ঝাপসা মতো মনে পড়া। কনস্ট্রাকশনগুলো এদিক-ওদিক হয়ে যে জিনিসটা সে-মুহূর্তে মাথায় ঢুকে পড়ছিল, সেইটা যেন অনেকটা যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে এখন তৈরি করার চেষ্টা করছি। এগিয়ে নিতে চাইছি। বিরক্তি ধরে যায় নিজের ওপর। ক্লান্ত লাগে। তখন মনে হয় 'থাকগে ছেড়ে দাও।' ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে।

এই দ্বিতীয় স্রোতের আক্রমণ যাদের মনের মধ্যে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে তাদের অনেকেই, কিছুটা নিরুপায় হয়েই, লেখার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অন্তত প্রথম জীবনে। পরবর্তী সময়ে সম্পাদকদের চাপ কাজ করে ঠিকই। সেই চাপটা আর কিছু নয়, একটু ঠেলা দিয়ে ওই দ্বিতীয় স্রোতের দিকে এগিয়ে দেওয়া, বা তার মধ্যে এনে ফেলা। কিন্তু সে তো হচ্ছে অনেক পরের কথা, যখন লিখতে লিখতে সে লেখার একটা সচল অভ্যাসের মধ্যে এসে পড়েছে। লেখা শুরুর সেই প্রথম দিকটা পার হয়ে এসেছে অনেক দিনই।

আমাদের ইস্কুলে দু'জন পণ্ডিত মশাই ছিলেন। তাদের, একজনের নাম ধরা যাক সুবল মুখোপাধ্যায়। সৌম্যকান্তি, গৌরবর্ণ, মধুর স্বভাব। তিনি যখন ইস্কুলের লম্বা বারান্দা দিয়ে, বুকের কাছে একটি মোটা সংস্কৃত বই ধরে, হাঁটাচলা করতেন, সবসময় কিছুটা অন্যমনস্ক, মুখে একটা হাসি-হাসি ভাব। কেউ কোনওদিন তাঁকে রাগতে দেখেনি। এই পণ্ডিতমশাইয়ের পূজাপাঠের খুব নাম ছিল। সর্বত্র উনি যেতে রাজি হতেন না। খুব সিলেক্টিভ ছিলেন। কোথাও ভাগবত পাঠ করবেন। কোথাও গীতা পড়বেন। লোক হত। মা শিক্ষিকা বলে আমার কাছে ঘেঁষার সুযোগ ছিল। তিনি পড়তেন উদাত্ত গলায়, সংস্কৃত কথার মানে না-বুঝলেও ধ্বনির জন্য ভাল লাগত। আমার আকর্ষণ অন্য দিকে। তিনি থেকে থেকে বিভিন্ন সুরে পাঠ করতেন। তিনি হয়তো ভাবতেন শিশুকাল থেকেই আমার মনে ভক্তিভাব প্রবল। আসলে আমাকে টান দিত ওই ধাপে-ধাপে উঠে যাওয়া গলা। হঠাৎ সামনের হারমোনিয়ম ধরে গেয়ে ওঠা। আমি ডানদিক ঘেঁষে বসে আছি, হঠাৎ বললেন, দ্যাখ, এই মালকোষ হল! কোনওদিন ভাগবত পাঠ করতে করতে হঠাৎ একটা জায়গায় সুরেই চললেন কিছুক্ষণ, কথা নেই, তারপর থেমে বললেন—অ্যাই, ভীষ্মদেব হয়ে গেল! 'ভীষ্মদেব' কথাটা যে কোনও বিশেষ রাগের নাম নয়, বরং একজন বিখ্যাত গায়কের নাম, এটা তখন বুঝিনি। এক-একটা বিশেষ জায়গায় উনি ভীষ্মদেব গানের মধ্যে যেমন যেমন রাস্তা নিতেন সেইভাবেই চললেন কিছুটা। তারপর বলে উঠলেন নিজেরই খুশিতে, 'ভীষ্মদেব' হয়ে গেল। পরে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় রেকর্ড শুনতে গিয়ে দেখি কোথায় যেন চেনা চেনা লাগে। পরে বুঝি পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে শুনছি আগে। অবশ্য উনি যা করতেন শ্রোতারা তাতেই মোহিত। শ্রোতা বলতে কিন্তু বেশির ভাগই বয়োবৃদ্ধরা। বলা উচিত, ঠাকুমা-দিদিমারাই



ছিলেন বেশি।

এই পণ্ডিতমশাইয়ের কিন্তু সবসময় একজন কেউ থাকত সঙ্গে। উনি একটু একলা হলেই কিছু বিড়বিড় করতেন। পাঠ শেষ হতে সকলে মুগ্ধ ও অনেকে সাশ্রু, পণ্ডিতমশাই রিকশায় উঠতে যাবেন, পায়ের ওপর একজন বুড়ি এসে পড়ল : বাবা আমার বউমা বাঁজা। কিছু একটা উপায় করুন। বুড়ির পিছনে নতমুখী একটি ঘোমটা-বউ। সঙ্গী তাড়া দিল, ঠাকুরমশাই চলুন, রাত্রে তো পূজা আছে। উনি রোজ রাত্রে পূজা করেন শোনা যায়। তিনি বউটির মাথায় একবার হাত রেখে রিকশায় উঠে পড়লেন। আমাদের বাড়ি একদিন এসেছেন, মা বলল, আচ্ছা সুবলবাবু, লোকে বলাবলি করে, আপনি কাউকে কিছু বললেই সেটা ফলে যায়। ব্যাপারটা কি সত্যি? বিশ্বাস করুন দিদিমণি আমি জানি না। কত লোক তো ঠগ-জোচ্চোরও বলে আমাকে। সে-সব মনে রাখি না। হঠাৎ দু'টো হাতের পাতা কানের দু'পাশে নাড়ালেন, ঠিক যেভাবে গায়করা, বিলম্বিতের সমে ফিরে এসে মাঝে মাঝে দুই তানপুরাকে নির্দেশ দেন। বললেন : কর্ণপিশাচ কর্ণপিশাচ! মা অবাক, মানে! অহোরাত্র কানে মন্তর পড়ছে কর্ণপিশাচ। কাকে কী বলে দিই, তা থেকে দু-একটা খেটে যায়। আর নাম হয়ে গেল। নাম তো ওই ভাবেই হয়। মা বলল, কর্ণপিশাচ মানে? এ কথা তো কখনও শুনিনি! উনি বলেন, সে একদিন বলব'খন। সারাক্ষণ কানের কাছে বলে চলেছে! মা আরও অবাক! কানের কাছে বলে চলেছে মানে? কী বলছে! ধরুন পাঠ করছি, বলল এবার যোগিয়া দাও, দিলাম, তো বলল, রামকেলি দাও, দিলাম। যে-দিন কিছু বলল না, সুর দিলাম না, এমনি পাঠ করে গেলাম। কর্ণপিশাচ যদি চুপ করে যায়, তো আমি বোবা!

সকল সার্থক শিল্পীর মতোই তাঁর মুখে ছিল অপার প্রশান্তি, বাইরে ছিল অনেক ভক্ত এবং গৃহে অকূল কলহ। যে দু-তিনদিন তাঁর বাড়ি গিয়েছি, সেই আঁচ দেখেছি। পরে উনি গেরুয়া ধারণ করে কনখল না কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন। সেদিন আমাদের বন্ধু অভিজিৎ চক্রবর্তীকে ফোন করেছি, এখন লোকে যেমন ফোন করেই বলে, আপনি কোথায়? বলা মাত্র অভিজিৎ বললেন, আপনার শচীন দাস মতিলালের পাড়া ক্রস করছি। 'না মানুঙ্গি'-র শচীন দাস মতিলাল আমার হলেন কী করে?

পণ্ডিতমশাই একদিন সকালে এসেছেন আমাদের বাড়ি, আমার বাবার বাৎসরিক কাজের ব্যাপারে বন্দোবস্ত করবেন। হঠাৎ বললেন, বাবারা, একটু রেডিওটা ছাড়ো তো! সাড়ে আটটার গান শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ শচীন দাস মতিলাল গাইবার কথা। খোলো তো! রেডিও চালালাম। ভরাট সেই পুরুষকণ্ঠের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়—যাঁর একটি রেকর্ডও কোথাও পাওয়া যায় না আজ।

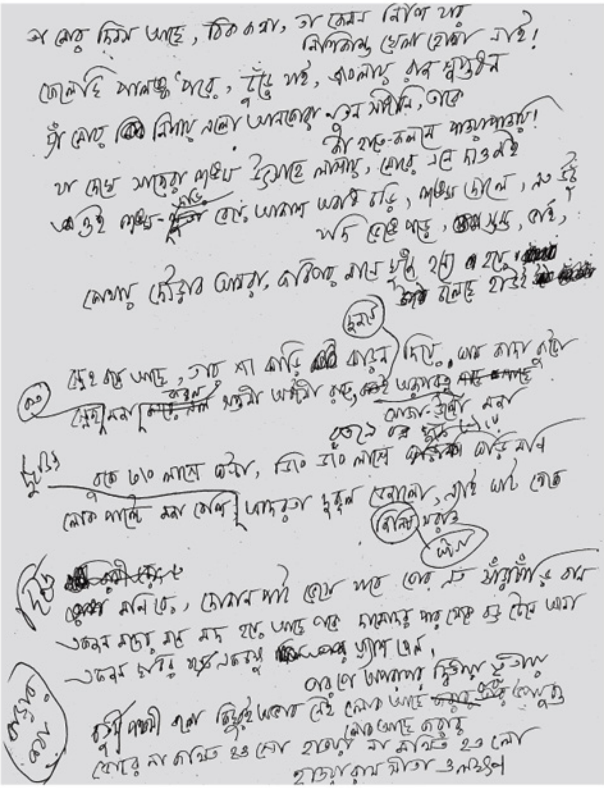
আজ। হ্যাঁ। আজ এতদিন পরে ভেবে দেখি 'কর্ণপিশাচ যদি চুপ করে যায় তো আমি বোবা' এ কথাটার মানে কী! 'কর্ণপিশাচ' বা এই ধরনের শব্দ শুনলে বুজরুকি মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ধরুন অফিস থেকে বেরিয়ে ডালহৌসি গিয়ে মিনিবাস ধরে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে সারা রাস্তা ধরে একদিন আমার মাথায় আসছিল 'পাগলী তোমার সঙ্গে' বইয়ের নাম কবিতাটি। বাড়ি এসে লিখে রেখেছিলাম। কোনওদিন হয়তো বাড়ি ফিরছি, বাস থেকে নেমে কয়েক পা হাঁটতেই মাথায় হানা দিতে শুরু করল লাইন, বাড়ি ফিরে দেখি বাড়িভর্তি লোক। তাদের সমবেত কথায় অংশ নিতে নিতে চাপা পড়ে গেল ভেতরে আসা লাইনগুলো। স্নানে ঢুকেছি। কল খুলে দিলাম, জল পড়ছে ধারায়, বালতির ভেতরে। জলের আওয়াজ নিমেষে ঘরের কোলাহল থেকে আমাকে পৃথক করে দিল। তখন হু-হু করে আমার আবার আসতে শুরু করল চাপা পড়া লাইনগুলো। কল থেকে বালতিতে পড়া জলের আওয়াজ যেন তানপুরার কাজ করল। সুরটা ধরে রাখল। স্নানশেষে সম্পূর্ণ একটা কবিতা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। এখন শুধু একটা

আড়াল খুঁজে তাকে লিখে রাখা। কতবার হয়েছে এমন।

এ অভিজ্ঞতা কি আমার একার? নিশ্চয় নয়। যারাই লেখার চেষ্টা করে তাদের সবারই এ প্রকার অভিজ্ঞতা নিশ্চয় হয়েছে। সুবলবাবু যাকে 'কর্ণপিশাচ' বলে চিহ্নিত করতেন, তাকে আমি বলছি 'দ্বিতীয় স্রোত'। কেউ যদি বলেন, তবে প্রথম স্রোত কি! এই যে যেটা আমাকে আমার সঙ্গে আপনাকে কথা বলায় ব্যস্ত রাখে, যেটা দিয়ে অফিস-কাছারির কাজকর্ম করছেন আপনি, যা দিয়ে বাইরের কাজ ও সৌজন্য, সামাজিকতা বজায় রাখছেন—সেইটা। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ আপনার ভেতরে যে-কথা বলতে শুরু করে, তাকে তো আপনি পুরো চেনেন না। কখন কথা বলে উঠবে জানেন না। সেই হল দ্বিতীয় স্রোত। যখন সে আসে তখন অসহায় লাগে—কী করে তার পুরোটা ধরে রাখব। একটা ভাঙা চিত্রকল্প, একটা অর্ধেক লাইন, অথবা একটা ওয়ান-অ্যান্ড-হাফ সঙ্গে নিয়ে সারাক্ষণ চলাফেরা—সিঁড়ি নামতে বাসে উঠতে সেটা দু-অ্যান্ড-হাফ হল। কখন বাড়ি আসব? পুরোটা ধরে রাখব—এই করতে-করতে কাটল জীবন। ধরতে-ধরতে কত কিছু হাত ফস্কে পড়েও যায়। আবার কখন সে চুপ করে যাবে তাও জানা নেই আপনার। কর্ণপিশাচ, কর্ণপিশাচ! কর্ণপিশাচ চুপ করে গেলেই আপনি বোবা।

রিলকের কবিতার অনুবাদ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, অর্ফিউসের প্রতি সনেট-এর কয়েক লাইনে যেন এ-কথাই বলা আছে কত কত আগে :

> গান যদি জাগে, তাই অর্ফিউস। সে আসে, এবং চলে যায়।
> সেই কি পর্যাপ্ত নয়, মাঝে মাঝে, গোলাপেরও পরে
> সে যদি কয়েকদিন আমাদের সংসর্গে কাটায়!



কিন্তু একবার যার এই দ্বিতীয় স্রোতের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার পক্ষে, সেই কি পর্যাপ্ত নয়, বলে, সেই দ্বিতীয় স্রোতের আর দেখা না-পাওয়া মেনে নেওয়া কঠিন! বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে, হেল্ড্যারলিন-এর কবিতাপংক্তি হয়ে একথা বলা দুরূহ তার কাছে : একবার বেঁচেছি দেবতা হয়ে, আর তাই যথেষ্ট আমার! একবার তার সংসর্গ পেলে বারবার তাকে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রেমেরই মতন।

অনেকদিন হয়ে গেল আমি নতুন কোনও কবিতা লিখিনি। প্রায় দু'বছর তো হলই। 'আর কবিতা লিখছেন না?' অথবা 'নতুন কবিতা কী লিখেছেন,' এই প্রশ্ন শুনি অহরহ। উত্তরে 'না' বলার পর, অবধারিত একটি 'কেন' জন্মায় প্রশ্নকর্তার মুখে। 'আসেনি' বা 'জানি না' বলে আমি সেই 'কেন'-টিকে নিবৃত্ত করি। 'কী কারণে করি?' কেননা সত্যিই আমি স্পষ্ট কারণ 'কী' তা জানি না। দু-একটা ব্যাপার অনুমান করি মাত্র, কিন্তু, সেসব নিশ্চিত করে বলার মতো কিছু নয়। একটার পর একটা দিন আসে। দিন চলে যায়। যাওয়া-আসার পথে বয়স বাড়ে। এক-একদিন, অফিসের চারতলার ছাদে, ক্যান্টিনের সিঁড়ির সামনে থেকে বিকেলের আলো দেখি। নবীন কবির লেখা মনে পড়ে যায় :

> কবুতর উড়ে গেল, ভাঙা সূর্যে কত সব রঙ...।
> সব রঙ বিক্রি হয় আমাদের পাঁচমাথা মোড়ে

একদিন হঠাৎ স্বপ্নে দেখি, সামনে ডায়েরি খোলা—তাতে নতুন লেখা কবিতা। আমার। এইমাত্র লিখলাম। বারবার পড়ছি। যেন মুখস্থ করে নেব। নতুন লেখার আনন্দ নিয়ে ঘুম ভেঙে যায়। জানলায় আলো দেখ মাত্র মিলিয়ে যায় সেই আনন্দ । আমার সরু খাটের পাশেই টেবিল। ছোট খাতার রুলটানা পাতা খোলা। বেড়ালরা যথাইচ্ছে হাঁটাচলা করেছে। দু'দিকের পাতায় তাদের ছোট-ছোট থাবার ছাপ ছাড়া কিছু নেই। এক্ষুনি যে-নবীন কবির লেখা বলেছি, সেই দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের কবিতাই মনে পড়ে ঘুমভাঙা সকালে :

> পাহাড়ের ওই পার থেকে ফের নতুন বছর
> চলে এল, তার দেহে বিজ্ঞাপন সাঁটে কারা যেন
> কারা যেন চাঁদা চায়, আঠা কেনে, দেওয়ালে লাগায়
> ডায়েরির পাতা জুড়ে গজিয়েছে ঘাস, ভাবি লেখা...

ঘাসপাতা-ভরা ডায়েরিকে আমি লেখার টেবিল থেকে সরিয়ে নীচে রেখে দিই!

ইচ্ছে বিরক্তি রাগ, বেফাঁস কিছু কথা

প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তীকে আমার ভাল লাগত। কোনও কোনও মানুষ আছেন যাঁদের সঙ্গে আড্ডা মারতে বসলে সময়টা বেশ ভাল কেটে যায়, অনেক নতুন কথা শোনা যায়। সুভাষবাবু সেই ধরনের মানুষ। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানুষ কোন ভাষায় কথা বলে, একশো বছর আগে কাদের সংখ্যাধিক্য ছিল, আগামী একশো বছর পরে কোন কোন জনপ্রিয় ভাষা লোপ পেয়ে যাবে, এই বিষয়ে কথা বলতে বেশ আরামবোধ করতেন। বয়সে আমার চেয়ে বছর দু'য়েকের বড় হওয়া সত্ত্বেও আমাকে দাদা বলে ডাকতেন। টেলিফোন বাজলে রিসিভার তুলে হ্যালো বললেই 'দাদা, সুভাষ বলছি' শব্দ তিনটি আমার পক্ষে ভোলা মুশকিল।

সুভাষবাবু বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় খবর রাখতেন বললে ভুল হবে, ভাল বইয়ের কথা শুনলে না পড়ে শান্তি পেতেন না। আমার যে বইয়ের কথা এখন কেউ বলে না, আড্ডা মারতে গিয়ে তার সম্পর্কে ওঁকে কথা বলতে শুনেছি। মাঝে মাঝে ওঁর সল্টলেকের বাড়িতে সকালে যেতাম, প্রতিবারেই অবাক হতাম। কয়েকশো মানুষ বাড়ির বাইরে, প্যাসেজে, নীচের তলার হলঘরে ভোর থেকে অপেক্ষা করে আছেন ওঁর সঙ্গে কথা বলার জন্যে। প্রত্যেক সংসারেই সকালবেলায় নিজস্ব কাজকর্ম থাকবেই কিন্তু অবাক হয়ে দেখতাম, সস্ত্রীক সুভাষবাবু এমনভাবে মানুষের সমস্যা নিয়ে ডুবে আছেন যে মনে হত তাঁদের কোনও সংসার নেই।

সুভাষবাবু সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি। সিপিএমের জমায়েতে তিনিই নাকি লাখ লাখ লোক এনে হাজির করেন। পার্টির বিরুদ্ধে অনেক বেফাঁস কথা প্রকাশ্যে বলা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হয় না নাকি ওই কারণে। শুনেছি, আন্ডারওয়ার্ল্ডের অপরাধীরা নাকি তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায়, সল্টলেক স্টেডিয়ামে কাউকে কাউকে তিনি আশ্রয়ও দিয়েছেন। কিন্তু ওঁর পাশে বসে কথা বলার সময় কখনওই মনে হয়নি আমি একজন মাফিয়া ডনের সঙ্গে কথা বলছি। যেহেতু সুভাষবাবু তাঁর রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তা আমার কাছে প্রকাশ করতেন না, ব্যক্তিগত কথাও বলতেন না, তাই এই বিষয়ে কথা বলাটা সৌজন্যের বাইরে বলে মনে করতাম।

বছর দুয়েক আগে আমার ঘনিষ্ঠজন রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী এসে জানাল সে বিপদে পড়েছে। কোনও কোনও লোক আগ বাড়িয়ে বোঝা তুলে নেয়, রমাপ্রসাদও সেই ধরনের। জানা গেল, আমেরিকার শিকাগো শহরে বঙ্গমেলার আয়োজন করা হয়েছে। রমাপ্রসাদ তাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দেশ থেকে যেসব শিল্পীরা যাবেন ওই মেলায় অংশ নিতে তাঁদের ভিসাও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এখানকার যে দু'জন ব্যবসায়ী তাঁদের বিমানের টিকিট স্পনসর করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তাঁরা শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়িয়েছেন। ইতিমধ্যে রমাপ্রসাদেরও কিছু খরচ হয়েছে। আর শিল্পীরা না যেতে পারলে বঙ্গমেলা বন্ধ হয়ে যাবে। হিসেব করে দেখা গেল অন্তত লাখ পাঁচেক টাকা দরকার। কে দেবেন এত টাকা? ভাবলাম সুভাষবাবুকে বলি। বিদেশে বাঙালিরা বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিকে প্রচার করতে চাইছেন, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটুকু সাহায্য করেন? টেলিফোনে ব্যাপারটা বলতেই একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কাল সকালে ওঁকে পাঠিয়ে দেবেন।' আর কোনও কথা নয়। সুভাষবাবু আমাকে যেতে বলেননি, কিন্তু রমাপ্রসাদ জোর করে আমায় নিয়ে গেল ওঁর সল্টলেকের বাড়িতে। বিস্তারিত বলছি না, বঙ্গমেলা শুধু রক্ষাই পেল না, সুভাষবাবুর সংগঠন 'পথের পাঁচালী' সেখানে গিয়ে সংগীত এবং নৃত্যের যে অনুষ্ঠান করল তাতে সবাই আনন্দিত হয়েছিলেন।

মাঝে মাঝেই সুভাষবাবুর ফোন আসত। কোনও বইমেলায় যাওয়ার জন্যে, কোনও ভাল কাজের জন্যে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেন। মানুষটির বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে না বলতে পারতাম না। বছর দেড়েক ধরে শুনছিলাম উনি পুরোপুরি সুস্থ নন। অথচ আমার সঙ্গে গল্প করার সময় সেকথা একবারও বলেননি। মাঝে মাঝেই শুনতাম উনি দিল্লিতে যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্যে। গত গ্রীষ্মে সারা দেশ যখন গরমে কাহিল তখন সুভাষবাবুর বাড়িতে গিয়ে অবাক হলাম। ভদ্রলোককে খুব শীর্ণ এবং দুর্বল দেখাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে?'

তিনি হেসে বললেন, 'তেমন কিচ্ছু নয়।'

শুনলাম পরের দিনই হলদিয়ায় যাবেন লোকসভার নির্বাচনী প্রচারে নেতৃত্ব দিতে। প্রতিবাদ করেছিলাম, 'আপনার কি মাথার ঠিক নেই? মেদিনীপুরে এখন ভয়ঙ্কর গরম, এই অসুস্থ শরীরে আপনি ওখানে বক্তৃতা করতে যাচ্ছেন?'

বিষণ্ণ হাসি ফুটল ওঁর ঠোঁটে, 'পার্টির নির্দেশ, আমি তো সৈনিক মাত্র।'

'আপনার পার্টির নেতারা অসুস্থতার কথা জানেন?'

'এ প্রসঙ্গ থাক। নতুন কী লিখছেন বলুন!'

সুভাষবাবু হলদিয়ায় গিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। এবং তারপরেই জানতে পারলাম ওঁর পায়ে একটা ক্ষত হয়েছে যা কিছুতেই সারছিল না। ডাক্তাররা সেটাকে ক্যানসার বলে সন্দেহ করেছিলেন। সেটা প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দিল্লিতে যান চিকিৎসা করাতে। তাঁর কেমোথেরাপি চলছে।

ফিরে এলেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথাও বললেন না। এক সকালে গিয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। সেদিনও প্রচুর সাক্ষাৎপ্রার্থী বাড়ি জুড়ে রয়েছেন। আমি দু'চারটে কথা বলে উঠব উঠব করছি এমন সময় এক বৃদ্ধকে নিয়ে এক মধ্যবয়সিনী এলেন। তাঁদের পোশাক দেখেই বোঝা যায় দারিদ্রশ্রেণির শেষপ্রান্তে অবস্থান করেন। সুভাষবাবু বললেন, 'বলেন!'

মহিলা কেঁদে ফেললেন। সুভাষবাবু বললেন, 'কাঁদলে তো কিছুই শুনতে পাব না।'

বৃদ্ধ কথা বললেন। ওঁরা উত্তর চব্বিশ পরগনার একটি খাস জমিতে গত পঞ্চাশ বছর ধরে চালাঘর তুলে বাস করেন। ওঁদের সঙ্গে আরও সাতটি পরিবার আছে। মহিলা বৃদ্ধের কন্যা। স্বামী নিরুদ্দেশ। বাড়ি বাড়ি কাজ করে সংসার চালান মহিলা। বৃদ্ধ বাবা ছাড়া সন্তান এবং অসুস্থ মা আছেন ঘরে। মাস দুয়েক আগে সরকারি অফিসার তাঁদের খাসজমি ছেড়ে উঠে যেতে বলেন। কোথাও যাওয়ায় জায়গা নেই বলে তাঁরা আবেদন করেন উৎখাত না করার জন্যে। কিন্তু আবেদন আগ্রাহ্য করে তারা গতকাল জানিয়েছে আগামিকাল পুলিশ এসে ঘর ভেঙে দেবে। বৃদ্ধ এবং মহিলা সুভাষবাবুর কাছে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন রক্ষা করার জন্যে।

সুভাষবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আশ্চর্য! সরকারি জমিতে আপনারা জোর করে ঘর বানিয়ে আছেন। এটা আইনবিরুদ্ধ। সরকার তার জমির দখল তো নেবেই। আমি একজন মন্ত্রী হয়ে যাতে সেই কাজে বাধা দিই তাই আমার কাছে এসেছেন?'

মহিলা বললেন, 'আমাদের আর কারও কাছে যাওয়ার জায়গা নেই যে!'

সুভাষবাবু অনড়। ওঁরাও কান্নাকাটি করছেন। যাঁরা ভিড় নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা ওদের চলে যেতে বললেন।

দেখলাম সুভাষবাবুর মুখের চেহারা আচমকা বদলে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের ওখানে এক ভাঁড় চায়ের দাম কত?'

এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে আমি হেসে ফেললাম।
বৃদ্ধ বললেন, 'দেড় টাকা।'
'দেড়শো টাকা জোগাড় করতে পারবেন?'
বৃদ্ধ তাঁর মেয়ের দিকে তাকালেন। মেয়ে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললেন।
'তা হলে আপনাদের এলাকার একশোটা ছেলেকে ডেকে ওই জমিতে বসতে বলুন। ওদের এক ভাঁড় করে চা খাওয়াবেন। পুলিশ এসে বুঝবে ঘর ভাঙতে গেলে আগে ওদের সরাতে হবে। মনে হয় সেই ঝামেলায় ওরা না গিয়ে, ফিরে যাবে। তখন সময় পাবেন আবার আবেদন করার।'
'অত ছেলে কোথায় পাব?' মহিলা হতাশ গলায় বললেন।
'ঠিকানাটা এদের কাছে রেখে যান।'
ওরা চলে গেলে বললাম, 'আজব ব্যাপার করলেন তো!'
সুভাষবাবু বললেন, 'আমি মন্ত্রী হিসেবে বেআইনি কাজ করতে পারি না। আবার এই গরিব মানুষদের গলাধাক্কা দিয়ে আকাশের নীচে বের করে দিতেও পারি না।'

শেষবার তিনি দিল্লিতে গেলেন চিকিৎসার জন্যে। ডাক্তাররা বলেছিলেন কেমো নেওয়ার পর কয়েকদিন থেকে যেতে। ওইসময় শরীরের প্রতিষেধক শক্তি অনেক কমে যায়। কিন্তু তখন পশ্চিমবাংলার বাস-মালিকরা ধর্মঘটের হুমকি দিচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনার জন্যে বামফ্রন্ট সরকারের অনেক মন্ত্রী ছিলেন। নিয়ম ভেঙে অসুস্থ সুভাষবাবুকে চটজলদি কেন আসতে হল? তিনি যদি নিজেই আসতে চেয়ে থাকেন তা হলে তাঁর পার্টি আপত্তি করেনি কেন? সেই মিটিং-এ ভদ্রলোককে যেভাবে অপদস্থ করা হল তা আমরা টিভিতে দেখেছি। দেখেই মনে হচ্ছিল সুভাষবাবু যে কোনও মুহূর্তে মাটিতে পড়ে যাবেন। পরপর দু'দিনের সেই উত্তেজনায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি।



প্রতিষেধক ক্ষমতা কমে যাওয়ায় নতুন রোগ সংক্রামিত হল তাঁর শরীরে। তবু হাসপাতালে যাওয়ার সময় ভেবেছিলেন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েই পরদিন ফিরে আসবেন। তাঁর কিছুই হয়নি।

প্রথম তিনদিন হাসপাতালের ডাক্তাররা বুঝতেই পারেননি সুভাষবাবুর অসুখটা কী? এটা যে ক্যানসারের প্রত্যক্ষ কারণ নয় তা অস্পষ্ট ছিল না। সুভাষবাবুর স্ত্রী তৃতীয় দিন থেকেই অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন, চেয়েছিলেন স্বামীকে দিল্লিতে নিয়ে যেতে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত সুভাষবাবুর স্ত্রী দিল্লির ডাক্তারকে কলকাতায় আনতে পারলেন কিন্তু তার আগেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সুভাষবাবুর অসুস্থতা কী কারণে বুঝতে পেরে চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। ডাক্তাররা চিকিৎসা যখন করেন তখন ধরে নেওয়াই উচিত তাঁরা সঠিক পদ্ধতিতে এগোন। মৃত্যুর আগের রাত্রে প্রায় এগারোটা পর্যন্ত হাসপাতালে থেকে জানতে পারলাম ওঁর অবস্থার অবনতি হয়েছে। প্রয়োজনে সেই রাত্রেই



ডায়ালেসিস করা হবে।

ভোর সাড়ে ছ'টায় ফোন পেলাম, সুভাষবাবু নেই। অদ্ভুত অবসাদে ভরে গেল মন। হাসপাতালে ছুটলাম। হাজার হাজার মানুষ সেখানে, কেউ কাঁদছেন, কেউ গম্ভীর। আর তারপরেই জানতে পারলাম তিনি তখনও জীবিত। ওঁর স্ত্রীর বক্তব্য হল, 'ভোর তিনটে নাগাদ ঘর খুলে দিয়ে আমাদের বলা হল শেষ দেখা দেখে যেতে। আমরা সবাই গেলাম। তার কিছুক্ষণ বাদেই আবিষ্কার করলাম ওঁর হার্টবিট রয়েছে, শরীরও গরম। চেঁচামেচি করে সেটা জানাতে আমাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হল। বলা হল উনি জীবিত আছেন। এখনই রক্ত দিতে হবে। আবার চিকিৎসা শুরু হবে।'

কোনও সভ্য দেশে এরকম ঘটনা কী করে ঘটে আমার জানা নেই। হাসপাতালের সামনে যেমন দর্শকদের সংখ্যা বেড়েছে তেমনি মন্ত্রী এবং নেতারা পৌঁছে গিয়েছেন একতলার পাশের প্যাসেজে। সবাই শোকার্ত, গম্ভীর। প্রত্যেকেই জানতে চাইছেন তিনি জীবিত আছেন কি না। শেষ পর্যন্ত বারোটার কিছু আগে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শ্রী বিমান বসু ঘোষণা করলেন সুভাষবাবু সকাল এগারোটা পঁয়ত্রিশে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

মৃত্যুর পর, যতদূর জানি, ডাক্তারি শাস্ত্রের মতে চারঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করার পর ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হয়। শরীরে মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে গেলেও কোনও অলৌকিক প্রতিক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষা করা হয়। সুভাষবাবুর মৃত্যুর ঘোষিত সময়ের মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শহরের মাঝখানে সংরক্ষণের জন্যে। কেন স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী চারঘণ্টা অপেক্ষা করা হল না? তা হলে কি তাঁর মৃত্যু এগারোটা পঁয়ত্রিশে নয়, তার আগেই হয়েছিল?

এতকাল কেউ কোনও কথা বলেননি। হঠাৎ সুভাষবাবুর স্ত্রী সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রসঙ্গ তোলায় বিষয়টি আলোচনা হচ্ছে। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ বলেছেন, লিখিত অভিযোগ পেলে তারা অনুসন্ধান করবেন। বামফ্রন্ট বা সিপিএম এই ব্যাপারে কোনও কথাই বলেনি।

আমি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। চিকিৎসকদের ওপরই নির্ভর করি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ছিল কি না তা আপাতত চোখে দেখলেও প্রথাগতভাবে কিছু বলা অনুচিত হবে। কিন্তু সমস্ত কিছু জানার পর বুঝেছি সুভাষবাবু সাঁড়াশির মাঝখানে পড়ে গিয়েছিলেন। অসুখের গোড়ার দিকে ভয়ঙ্কর গরমে পার্টি যখন তাঁকে হলদিয়ায় লক্ষ্মণ শেঠকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিতে বলেছিল তখন স্বাস্থ্যের কারণে তিনি অস্বীকার করতে পারতেন। শেষ পর্যায়ে দিল্লির ডাক্তাররা যখন তাঁকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন যাতে সংক্রমণের শিকার না হন, তখন বাস মালিকদের শান্ত করতে তাঁকে কলকাতায় ডেকে এনে মিটিং-এ বসতে কেন পার্টি অনুমতি দিল? সুভাষবাবু নিজেই অক্ষমতা কেন জানালেন না? সাঁড়াশি বলেছি কারণ একদিকে নিজের স্বাস্থ্য, অন্যদিকে মৃত্যু বেশি দূরে নয় জেনেও তাঁর কাছে পার্টির নির্দেশই ছিল শেষ কথা, তিনি সৈনিক মাত্র। অতএব নিজের কথা, বিবেক কী বলছে, তা উপেক্ষা করতে এঁরা দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিলেন রাজনৈতিক জীবন শুরু করার দিন থেকেই। পঞ্চাশ থেকে ষাট সালে এমন অনেক কমিউনিস্ট কর্মীকে দেখেছি নিজের দিকে না তাকিয়ে পার্টির জন্যে কাজ করেছেন। অভাবের থাবা উপেক্ষা করে বলেছেন, এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যেতেই হবে। তাঁরা হারিয়ে গিয়েছেন। পার্টি তাঁদের কিছু দেয়নি। ক্ষমতায় আসার পরে দেখা গেল ওই মানুষগুলো আর পার্টিতে নেই। সুভাষবাবু সেই মানুষগুলোর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। সাম্প্রতিক সাংসদের মতো বলতে পারলেন না, প্রথমে আমার বিবেক তারপর পার্টি। লক্ষ মানুষ তাঁর শেষযাত্রায় পথে নেমেছিলেন এক বিরল নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে। যিনি ফোন করে সহজ গলায় বলতে পারতেন, 'দাদা, সুভাষ বলছি।'

রোববারের ক্রমশ

অষ্টম গর্ভ

বাণী বসু

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ২

বিকেলের রোদ হেলে পড়েছে। শনিবার। দিদিভাই এখনও গা ধুয়ে বেরননি। কিন্তু মাস্টারমশাই এখনও কানুমামুকে পড়িয়েই চলেছেন, পড়িয়েই চলেছেন। সে কখন ইস্কুল থেকে এসে লুচি আর পেঁয়াজকলির চচ্চড়ি দিয়ে জলখাবার খেয়ে নিয়েছে। অপেক্ষা করে রয়েছে মামুফুল উঠবে, তাকে নিয়ে বেরবে। আজকে শ্যামপার্কে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট আছে, যেতে হবে না? কিন্তু দু-পা দূর হলেও দিদিভাই তাকে ছাড়বেন না। একমাত্র দেশবন্ধু পার্ক ছাড়া আর কোথাও তার একা একা যাওয়ার হুকুম নেই। অবশ্য ছাড়লেও একা একা গিয়ে মজা নেই। তার যদি অনেক বন্ধু থাকত, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হইহই করে চলে যেতে পারত তা হলে আলাদা কথা। কিন্তু বন্ধুও নেই এদিকে মামুফুল কথা দিয়েও কথা রাখছে না।

বুনবুন এক নাগাড়ে লাটিম ঘুরিয়ে যায়। লাটিমে মন নেই তার, মন পড়ে আছে ছাতের ঘরের দিকে যেখানে মামুফুলের চশমা পরা মুখের আধখানা আর মাস্টারমশায়ের দাড়ি-গোঁফঅলা মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে। কী যে এত পড়ান মাস্টারমশাই, দু'ঘণ্টা তো হয়ে গেল! হঠাৎ তার কান খাড়া হয়ে ওঠে।

—একে কি স্বাধীনতা বলে? বড়লোকের ছেলেরা আর সব যত্ত বুর্জোয়া গোলটেবিলে বসে আজাদি ঠিক করল। একবার ভাবো কাঞ্চন, এতে ক্যাপিটালিস্ট ছাড়া কার লাভ হবে? পাঞ্জাব বাংলা ধ্বংস, দ্বিখণ্ড, বাংলা ধ্বংস একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। যে লোকগুলো জেনারেশনের পর জেনারেশন নরম পলি মাটিতে চাষবাস করে আসছে তাদের পাঠাচ্ছে দণ্ডকারণ্য, যেখানে মাথা খুঁড়ে মরলেও এক ইঞ্চি জমি টলবে না। পাথর সব পাথর। টাঁড় জমি বলে ওকে। এত বড় বড় কাঁকড়াবিছে, গোখরো সাপের চেয়েও তার বিষ সাংঘাতিক!

কানু চেঁচিয়ে বলে—এই বরুণ ওখানে কী করছিস?

—ও খেলছে, খেলতে দাও না! মাস্টারমশাই বললেন।

মামু আস্তে গলায় বলল—ও খেলছে না সুকুমারদা, ও শুনছে, ভীষণ চালাক, প্রত্যেকটি কথা মায়ের কাছে গিয়ে রিপিট করবে। এই বরুণ! বুনবুন!

—কী?

—নীচের উঠোনে গিয়ে খেল গে যা না।

—তুমি তোমার পড়া শেষ করো না, আমি কি তোমাকে বিরক্ত করেছি?

—লক্ষ্মী ছেলে, তোকে খেলতে দেখে আমারও মন বসছে না, একটু পরেই যাচ্ছি! সেই টুর্নামেন্ট তো!

প্রচুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুনবুন নীচে নেমে যায়। না হলে, আজকের টুর্নামেন্টটা তো গেলই, মামুফুল তাকে কোনওদিন আর সার্কাসে, ময়দানের প্যারেডে, ঘোড়া পুলিশ দেখতে কিংবা ক্রিকেট মাঠে নিয়ে যাবে না। শীতের শিরশিরে সবুজ দিনে বেশ ইডেন গার্ডেনে বসে বসে কমলালেবু আর চিনেবাদাম খেতে খেতে রঞ্জি দেখা। পি রয়, পি সেন, মানকড়, ফাদকার...। বলবে—দূর, তুই কথা শুনিস না। মাত্র পাঁচ বছরের বড় এই মামুফুল তার ওপর যা খবরদারি করে তা বলরাম টামও কৃষ্ণের ওপর করতেন না।

এত বড় বাড়ি। কোথাও কেউ নেই। দাদাভাই গিয়েছেন গীতাসভা, দিদিভাই গিয়েছেন গা ধুতে। মাসিমা আর হারান থাকতে তবু একটা গল্প করার মানুষ ছিল, হারানকে প্রচুর উপদেশ দেওয়া, পড়ানো, গাঁট্টা মারা এ সবও চলত। এখন দিদিভাই যে সারাদিন ধরে খুটুর খুটুর করে কী এত করেন। আগেকার মতো গল্পও বলেন না আর। বলেন, বড় হয়েছ, পড়ো, ভাল ভাল বই পড়ে বরং তুমিই আমাকে গল্প বলো। অন্য কারও বাড়ি যাওয়া কী রাস্তায় ঘোরাও দিদিভাই একদম পছন্দ করেন না। সবাইকার সঙ্গে মেলামেশা চলবেই না। সাধে কি আর বুনবুনের বন্ধু নেই!

মামুফুল একদিন তার হয়ে বিদ্রোহ করেছিল অবশ্য!—আচ্ছা মা, রাস্তার ছেলেরাও কারও না কারও বাড়ির ছেলে, তারাও মানুষ, বুনুকে ওরকম টিপিকাল বুর্জোয়া করে মানুষ করাটা কি ঠিক?

—কী জোয়া?

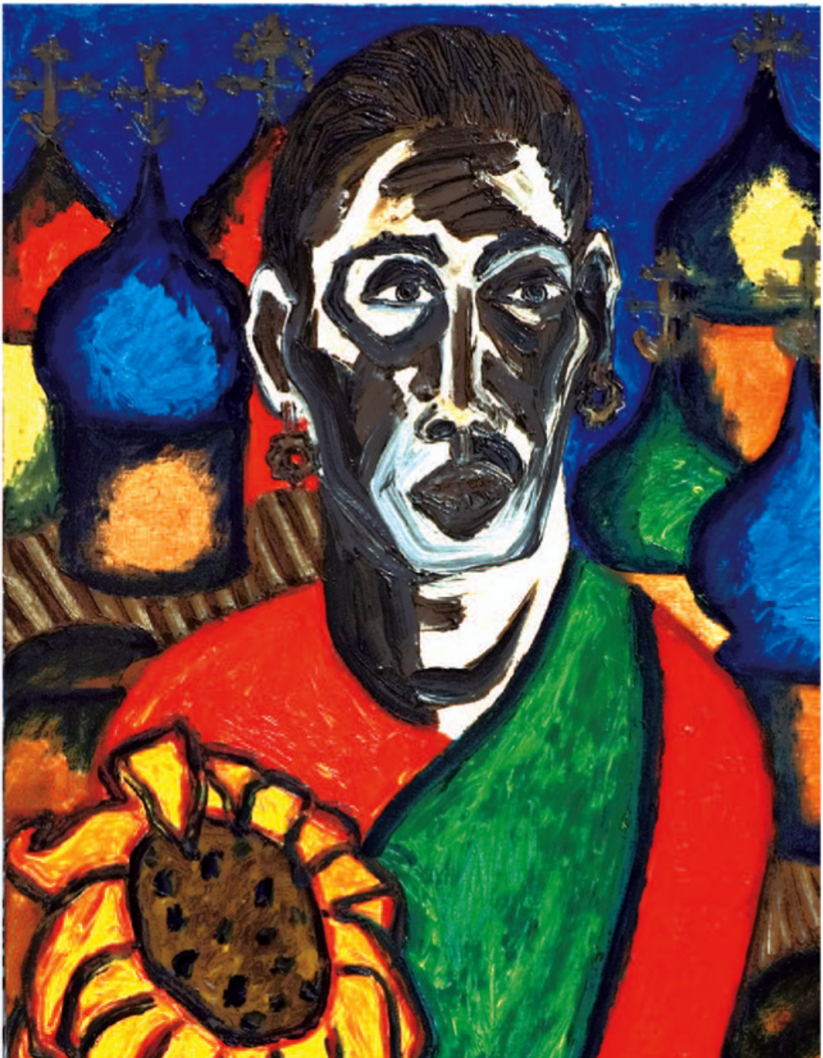
—বুর্জোয়া। ও তুমি বুঝবে না।

—আরেকটু বড় হ ছোটকু, পাশ-টাশ করে বার হ, তারপর আমার চেয়ে বেশি বুঝিস। জানিস ও বাড়ির সুবুলের কান ফাটিয়ে দিয়ে এসেছিল বুনু, আর একদিন নিজে এমন মার খেয়েছিল যে কনুইয়ে গালে কালশিটে পড়ে একেক্কার। দেখিসনি না মনে নেই? আর কী খারাপ খারাপ গালাগাল শিখেছিল, ছি ছি!

—অত প্রোটেকশন ভাল না মা, কবে ও নিজেকে ডিফেন্ড করতে শিখবে?

—দিব্যি শিখেছে। ও বাড়ির সুবুলের মা এসে আমায় যা নয় তাই বলে যাননি? বুনু সুবুলকে মেরে পাট করে দিয়েছে, সুবুল খোঁড়াচ্ছে, কোঁকাচ্ছে! আর ওই সব যাচ্ছেতাই কথা! না বুঝে বলছে এখন, কখন কার মুখের ওপর বলে দেবে! আমি ওকে যেতে দেবো না, ব্যস।

বুনবুন একটা জিনিস আজকাল আবছা আবছা বুঝতে পারে। কানুমামুর ওপর দিদিভাইয়ের আগেকার দাপটটা আর নেই। মামু বড় হয়ে গিয়েছে, সে, দিদিভাই আর কানুমামু মিলে একখানা যেন ঘর ছিল। সেখানে দিদিভাই আজকাল থাকেন না, কানুমামুর ওপর তার ভার অর্ধেকটা ছেড়ে দিয়ে দিদিভাই আরেকটা ঘর থেকে তার দিকে লক্ষ রাখছেন। ঘরটা আরও বদলাচ্ছে। মামু



সেখানে থাকে অথচ থাকে না। কোথায় একটা দেওয়াল উঠে গিয়েছে তার আর মামুর মধ্যে। মামু কী সব পড়ে তার বিন্দুবিসর্গ বোঝে না বুনবুন। কিন্তু মামুর এই নতুন জগৎটার প্রতি তার অদম্য আকর্ষণ। দিদিভাইয়ের জগৎ আর কানুমামুর জগতে একটা প্রচণ্ড দড়ি টানাটানি চলছে বুনবুনের ভেতরে।

সেবার মামুর সঙ্গে একলা হতেই মামু তাকে জিগ্যেস করেছিল—কী রে, সুবুলকে আচ্ছা করে ঠেঙিয়েছিলি?

—হুঁ।

—কেন?

—ও আমার চেয়ে লম্বা তো, ফট করে আমার কান ধরে হ্যাঁচকা দিল—বেঁটে বামুন, তুই ক্রিকেটের কী বুঝিস রে? ব্যস আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। পিটিয়ে দিলুম।

—বেশ করেছিস। কেউ তোর ওপর জোর ফলাতে এলেই স্টেপ নিবি। ভালমানুষ হয়ে থাকিসনি। তা ও যে খোঁড়াচ্ছে, কোঁকাচ্ছে! এত মারলি?

—ও কেন প্রথম মারটা খেয়ে আমায় গালাগাল দিল!

—কী গালাগাল?

—বলব না। দিদিভাইকে বলেছিলুম, আর কাউকে বলতে

বারণ করে দিয়েছেন।

—আমায় বলো, না হলে কী করে বুঝব কার বেশি দোষ? এটা মায়েরা বিচার করে না। একদল আমার মায়ের মতন খালি নিজের ছেলের দোষ ধরে, আর এক দল সুবুলের মায়ের মতো পরের ছেলের ওপর চোখ রাঙায়।

—বলেছিল খচ্চর, বলেছিল বানচোৎ—লাজুক চোর চোর মুখে সে বলে।

—জানিস এ গুলোর মনে কী?

—খচ্চর তো একটা বিশ্রি জন্তু। গাধার চেয়েও খারাপ। বানচোৎটা নিশ্চয় আরও খারাপ জন্তু।

—বেশ, তা তুই শুনে কী করলি?

—আমিও গালাগাল দিলুম, তারপর মারলুম।

—কী বললি?

—বললুম বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর।

একটা হাসি কানুমামুর মুখে উঁকি দিয়েই লুকিয়ে পড়ল!—কোথা থেকে শিখলি এটা?

—রানিমাসিমার কাছে।

—ভাল, এবার ওইসব গালাগাল তোকে আশা করি দেবে না। কিন্তু দিলে তুই বলবি—বাস্টার্ড।

—বাস্টার্ড? এই অদ্ভুত গালাগালটা সে আগে কখনও শোনেনি। ইংরেজি না হিন্দি?

কানু বলল—বলবি আর ধাঁই করে মারবি। মানেটা ধরতে পারবে না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে।...তবে দেখিস আবার মায়ের কানে না যায়।

বাস, এইটুকু বলেই কানুমামুর অনেক সাপোর্ট দেওয়ার হয়ে গেল বুনবুনকে। দু-চার জোর কদমে সে দোল-দরজা ধরে ফেলেছিল। তারপর হাওয়া। কানুমামু তার চিরকালের সঙ্গী এমনি অচেনা ভাষায় কথা বলবে, হাওয়া হয়ে যাবে, মাসিমা আর হারান থাকবে না, ও বাড়িও এখন যাওয়া চলবে না। এত না না'র মধ্যে বুনবুন আর পেরে উঠছে না।

মাসিমা হারান ওঁরাই বা কেন চলে গেলেন? দিদিভাইকে জিগ্যেস করলে উত্তর পাওয়া যায় না। ওঁর মুখটা কেমন কঠিন হয়ে যেতে থাকে। সে জানে মাসিমা গিয়েছেন বর্মার জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি কাজ করতে। এখানে তো মাইনে পেতেন না, কিন্তু হারানকে বড় করে তুলতে হবে, দশজনের একজন, তাই চাকরিটা নিতে বাধ্য হলেন। এখন-সেখানে আলাদা বাড়ি, হারানের নাকি আলাদা ঘর, মাসিমা সারাদিন রাত জ্যাঠামশাইয়ের সেবা করেন, ভাল মাইনে পান, জমাচ্ছেন, জমিয়ে বুনবুনকে একটা সাইকেল কিনে দেবেন বলেছেন। সে জানে, বলেছেন যখন দেবেনই দেবেন, মাসিমা মিছে কথা বলেন না। কিন্তু তাকে সাইকেল কিনে দেওয়ার জন্যে আর হারানকে দশজনের একজন করার জন্যে মাসিমাকে চলে যেতে হল এটা সে মানতে পারেনি। হারানকে তো তারা খুবই লেখাপড়া শেখাচ্ছিল, আর একটা দু'টো বছর তার পরেই দিদিভাই ওকে স্কুলে ভর্তি করে দেবেন বলেছিলেন। এমন সময়ে মাসিমার কী এত টাকার দরকার পড়ল? দিদিভাই কত যত্ন করে খেতে দিতেন মাসিমাদের। কাপড় ছিঁড়ে গেলেই কাপড় এসে যেত, মাসিমাও কত মাথা টিপে দিতেন দিদিভাইয়ের, কত চমৎকার সব রান্না করতেন। আর গল্প? মাসিমার দ্যাশের গল্প শুরু হলে তো আর শেষ হতেই চাইত না। তাঁদের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে কেমন মধুমতী নদী, বাপের বাড়ি ধলেশ্বরী। নৌকো করে মামারবাড়ি যাওয়া, উঁচু তক্তপোশের তলায় কেমন আলু, নারকোল। কুটুম এলে পুকুরে জাল ফেলে ধড়ফড়ে মাছ ধরা, বাতাবিলেবু দিয়ে বল খেলা! অদ্ভুত সব গল্প। স্বপ্ন বলে মনে হত। এত গাছ, এত ফল, এত বুনো ফুল আর নদী দিয়ে একটা দেশ তৈরি হতে পারে, তার কি ধারণা ছিল? মাসিমা বলতেন—তোমাদের এ শহর তো সদরের ফাটক বুনু, শুধু ইট আর কাঠ। পুষ্করিণী নাই, হাঁস নাই, কাঠ-ঠোকরা নাই, ফলফুল বাজার হইতে আসে, সামান্যই ঢেকি কলমিও কিনতে হয়, এ আমরা কখনও দেখি নাই।

সে কিছুক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে রইল সিঁড়ির মাথায়। আকাশপাতাল ভাবনা তার। কবে যে তার পনেরো যোলো বছর বয়স হবে, কবে কানুমামুর স্যর তাকেও ঝুটা আজাদির কথা খোলসা করে বলবেন! সে যে একেবারে জানে না তা তো নয়। ঝুটা মানে মিথ্যে, আজাদি মানে স্বাধীনতা। দেশভাগের ফলে শেয়ালদা স্টেশনে কীভাবে ওপারের মানুষ এসে অকথ্য নোংরা আর কষ্টের মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়েছে, সে তো বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখেছে। কালো মিনু কীভাবে হারিয়ে গেল সে তো ভোলেনি, ফরসা মিনু যে বুবুদের সঙ্গে এক্কাদোক্কা চু কিতকিত খেলে তাদেরও যে কত দুর্দশা তা-ও সে দেখেছে, বেশি কথা কী! রানি মাসিমা! ওঁদের তো সব চুরমার হয়ে গিয়েছে। সে নিজে তো সব সময়ে চাইছে দেশটা জুড়ে যাক, মিনুরা মাসিমারা নিজেদের গ্রামে ফিরে যান, আবার সেই রূপকথার মতন জীবন হোক ওঁদের, নৌকায় করে ঘোরা, চাঁদনি রাতে মাছ ধরা স্কুল শেষে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, ফুল তুলতে তুলতে বাড়ি ফেরা। সে জানে বদমাশরা দাঙ্গা বাধিয়ে রানি মাসিমার একটা বুক কেটে নিয়েছে, যেখানটায় উনি পরেন ন্যাকড়ার পুঁটলি সেলাই করে ব্লাউজের মধ্যে, অনেক কিছুই আর ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু মধুমতী আর জম্বুরা, আর ঢেঁকি-কলমি শাকের সুন্দর দেশটুকু, নিজেদের বাড়িঘর তো ফিরে পাওয়া যাবে! ভাবতে গেলেই তার বুকের ভেতর কেমন তোলপাড় করে, যদি তাদের এই বারো নম্বর থেকে, চার নম্বর থেকে কয়েকজন গুন্ডা এসে বার করে দিত? হতে পারে এ দেশটায় তত নদী নেই, নৌকোয় করে যাওয়া-আসা নেই, এখানে খুব ইটকাঠ, বাজার থেকে সব কিনতে হয়, তবু এটাই তো তার দেশ, এটাই তো তার বাড়ি, কী করে কেউ এসে বলতে পারে তোমরা চলে যাও, এখানে আর থাকতে পারবে না? কেন যে তার ভগবানের সঙ্গে দেখা হল না, ভাব হল না, তা হলে সে নিশ্চয় কৈফিয়ত চাইত, হারানো জিনিস সব ফেরত চাইত, রানি মাসিমার কাটা-যাওয়া বুক পর্যন্ত, ভগবান যখন-তখন সবই তো দিতে পারেন।

শোনা যাচ্ছে চার নম্বরে নাকি ভগবান এসে গিয়েছেন, তাঁকে তুষ্ট করে পারলে সে এই প্রার্থনাগুলো পেশ করতেই পারে, অথচ দিদিভাই সেখানেও তাকে যেতে দিচ্ছেন না। বলছেন, একটু সময় করি, আমিই তোমাকে নিয়ে যাব। কেন? সে কি নিজে যেতে পারে না? বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের মধ্যে দিয়ে ইয়ো-ইয়ো ঘোরাতে ঘোরাতে সে কতবার তো যায়। বারো নম্বর যেমন শুনশান, চার নম্বর হল তেমনই সরগরম একখানা বাড়ি। বুবু-পুনপুনের সঙ্গে তার কতদিন যে কথাবার্তা খেলাধুলো হয় না!

বুবু আর পুনপুন আবার বড্ড ছেলেমানুষ। পুজোর সময়ে একটা থাক থাক দেওয়া গোলাপি ফ্রক হল তো বুবু খালি ফ্রকটা গায়ে ফেলে ফেলে আয়নায় দেখবে। তখন আবার তাদের দু'জনকে দরজায় পাহারা দিতে হবে। তাদের বাড়িতে যখন-তখন আয়না দেখা বারণ কিনা! দেখতে পেলে এইসা শাস্তি দেবে না টমদিদি! শাস্তির ডিপার্টমেন্ট পমদিদির বিয়ের পর এখন টমদিদির হাতে এসেছে। টমদিদি ঠিক কতটা কড়া এখনও বোঝা যাচ্ছে না অবশ্য। জুতো মোজা ফ্রক ফিতে ক্লিপ এইসব কোলে আঁকড়ে থাকবে বুবুটা। দেখো তো বুনবুন আমায় কেমন দেখাচ্ছে, দেখো তো পুনপুন আমায় কেমন দেখাচ্ছে? বারবার জিগ্যেস করবে, আর চারফুল ক্লিপ চুলে আটকে ঘুরে বেড়াবে যেন রাজকন্যে। এত ছেলেমানুষ! এত ছেলেমানুষ! আর পুনপুন? একটা ভিতুর ডিম। এই অন্ধকার হয়ে গেল, এই দূরের তালগাছটা ঝুপসি দেখাচ্ছে কেন, নির্ঘাৎ ওখানে ভূতেরা বেড়াতে এসেছে। বুনবুনের দুঃখ যদি রানিমাসিমা-হারান-কালো মিনু-ফরসা মিনু, পুনপুনের দুঃখ আবার অন্যরকম। ঝুপ সন্ধেয় আগে আগে যখন সন্ধে তারাটা দূরে সেগুন গাছটার পেছনে ওঠে তখন ছাতে উঠে পুনপুন বিড়বিড় করে কী সব বলে। কেউ জানে না কী, কিন্তু



ভাবত বড়মামু আর পাঁচজনের মতো নয়, বড়মামু এক ভারি মজার মানুষ। তাঁর সব অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনা। এত শিলনোড়া কে কিনবে? আয়নার ব্যবসা যারা করে তাদেরই বা কত লাভ থাকছে? কতদিনে পৃথিবীর সব শালগাছ ন্যাড়া হয়ে যাবে এইসব। মামিমার কথা তার মনে হয়—তাই তো! মজার না, অদ্ভুত!

—বড় মামুকে কেন রাত্তিরে বেরতে দেওয়া হয়েছিল? বুনবুন চিন্তিত হয়ে জিগ্যেস করে।

—যেতে আবার কে দেবে? নিজে নিজেই গিয়েছে। ছেলেমানুষ তো আর নয়! ভুলে-টুলে গিয়েছে বোধহয়, আর হেঁচে ফেলেছে!

—হেঁচে? সর্দি হয়েছিল না কি?

—অত জানি না, সর্দি না হলেও তো হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করছে দিনরাত।

নাঃ, হরিপাল এমনিতে খুব চমৎকার জায়গা। কিন্তু ওখানে যাওয়াটা খুব রিস্কি হয়ে যাবে। এ নিয়ে একদিন মামুফুলের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে।

সে যাই হোক, আপাতত তো এসব কিছুই হচ্ছে না। এবং অজ্ঞাত কারণে চার নম্বরে যেতে দিদিভাই বাধা দিচ্ছেন।

অবশেষে এই সমস্যার সমাধানের জন্যে সে দিদিভাইয়েরই দ্বারস্থ হয়। দিদিভাই কী একটা উনুন থেকে নামিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখলেন। তারপর এক হাঁড়ি জল চাপিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—কী রে বুনু, কিছু বলবি?

—আমি তা হলে কী করি এখন?

—কেন? কী হয়েছে?

—বাইরে খেলতে যেতে পাবো না, মামুফুল বেরিয়ে যাবে, তুমি রান্না করবে, তা হলে আমি কী করব? বিচ্ছিরি বিকেলবেলা! বলতে বলতে সে শরীর মোচড়ায়, গলা ধরে আসে।

দিদিভাই এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন, তারপর বললেন—আচ্ছা, তুমি শার্টপ্যান্ট পাল্টে নাও, আমিও তৈরি হয়ে আসছি। চলো আমরা চার নম্বর থেকে ঘুরে আসি।

সে একবারও চার নম্বরের কথা উল্লেখ করেনি। কিন্তু দিদিভাই ঠিক বুঝতে পেরেছেন ওইটাই তার আসল কথা। সে লাফাতে লাফাতে তৈরি হতে চলে যায়।

রিকশা থেকে বুনবুন লাফিয়ে নামল। জনা চারেক অচেনা লোক কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল চার নম্বর থেকে। আরও তিনজন লোক আর মায়েদের মতন দু'জন মহিলা ঢুকে গেলেন। এঁদের কাউকে বুনবুন চেনে না। এরা কে। সে অবাক হয়ে দিদিভাইয়ের দিকে তাকায়। দিদিভাই বলেন—চলো! ঢোকো! বাড়িতে ঢুকে বুনবুন একটা তীব্র গন্ধ পেল, ধূপ চন্দন ফুল-টুল মেশানো একটা গন্ধ। কত লোক কীরকম ভক্তি করে ওপরে চলে যাচ্ছে। নেমে আসছে। দিদিভাইকে দেখে এক মহিলা এগিয়ে এসে বললেন—যান দিদি যান, সত্যিকারের মহাপুরুষ! জীবনটা ধন্যি হয়ে যাবে একেবারে। আহা!—চোখ মুছলেন ভদ্রমহিলা। দিদিভাই বুনবুনের হাতটা শক্ত করে ধরে ওপরে উঠতে লাগলেন। যত ওপরে ওঠে ততই গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পুরো বাড়িটাই যেন ঠাকুরঘর হয়ে গিয়েছে। দোতলায় পিসিমার ঘরের দরজার ওপর থেকে মালা ঝুলছে। ঘরটার ভেতর থেকে

বুনবুন জেনে ফেলেছে। একদিন পেছনে থেকে গুঁড়ি মেরে মেরে গিয়ে শোনে পুনপুন বিজবিজ করে বলছে—হে গোখরো ঠাকুর হে পদ্মগোখরো আমায় পরশপাথরটা পাইয়ে দাও। আমি একটা ছোট ছেলে, কাউকে বকি না মারি না, ঝগড়া করি না, পাকুমা বলেছেন আমি পাথরটা পেতে পারি...। একলাফে বুনবুন হুপ করে একেবারে ওর সামনে! পুনপুন তো চমকে-টমকে একাকার! প্রায় কেঁদে ফেলে আর কী!...আমি আমি বুনবুন রে! তারপর ভীষণ লজ্জা। কিছুতেই বলবে না কী ব্যাপার। কিন্তু বুনবুন তো পাকুমার নামটা শুনে ফেলেছে। পদ্মগোখরোর গল্পটাও সে জানে। পাকুমা যে পরশপাথর পাওয়া গেল না বলেই প্রায়োপবেশন করেছিলেন, আর মানিক আর পুনপুনকে বলে গিয়েছেন তারা ভাল হলে নিশ্চয়ই পরশপাথর পাবে এই কথা শুনে বুনবুন তো হেসে বাঁচে না। পরশপাথর আবার আকাশ থেকে নেমে আসে না কি? নদীর তীরে, জঙ্গলের ধারে খুঁজতে হয়, কোমরে রাখতে হয় একটা লোহার চাবি, পাথর তোলো আর চাবিতে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে দেখো, চাবি সোনা হয়ে গেলেই বুঝবে ওটা পরশমণি।

কিন্তু যতই ছেলেমানুষ আর ভিতু হোক, বুনবুন খুব ভাল করে জানে তারা তিনে মিলে এক। বুবুর সাজগোজ-প্রীতি, পুনপুনের ভয় আর তার সাহস সব মিলে তবে তৈরি হয় একটা গোটা মানুষ। একলা সে ১/৩ মাত্তর। কী করছে ওরা? ওরাও তো আসতে পারে, না কি! আসছে না কেন? ভগবানকে বাড়িতে পেয়ে ওরা কি বুনবুনকে ভুলে গেল? অন্তত পক্ষে মামিমাও যদি থাকতেন! মামিমা অবশ্য বড্ড ভূতে বিশ্বাস করেন, আর ভীষণ হাসকুটে! হরিপালে নাকি সন্ধে হলেই মাঠেঘাটে ভূত বিজবিজ করে। প্রত্যেকটা গাছে ভূতের বাসা। অন্ধকার নামলেই এ গাছের ভূত ও গাছের ভূতের সঙ্গে কথা বলে। আর সেই কথা বলাবলির মধ্যে যদি তুমি হেঁচে ফ্যালো কী কেশে ফ্যালো, তা হলে ভূতে তোমাকে শাস্তি দেবেই দেবে।

—কী শাস্তি?

—এককেজনকে এককেরকম। যেমন কেউ বোকা হয়ে যাবে, কেউ কালা হয়ে যাবে, কারুর মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে যাবে। যেমন তোমার বড় মামুর...বলেই মামিমা হাসতে আরম্ভ করবেন। হাসতে হাসতে কেশে, মুখ লাল হয়ে অস্থির।

বড়মামুর মাথার মধ্যে কিছু একটা গন্ডগোল আছে সেটা বুনবুন ধরতে পারে। কিন্তু সেটা যে কী সে এতদিন ধরতে পারেনি। সে

একটা দমবন্ধ করা ধূপের গন্ধ আসছে। কোথায় যেন এমন গন্ধ? কবে যেন? বুনবুনের শরীরটা গুলিয়ে ওঠে। তবে কি পিসিমা মারা গিয়েছেন? তাই এতদিন দিদিভাই...।

ভেতর থেকে বাবার গলা ভেসে এল—আসুন মা আসুন, এতদিনে আসার সময় হল?

ঢুকে বুনবুন দেখল ঘরের একদিকে মোটা বিছানা করা, তাতে গেরুয়া রঙের চাদর পাতা। একজন লম্বা-চওড়া সাধু হাসিমুখে লোকেদের সঙ্গে কথা বলছেন। গেরুয়া রঙের সিল্কের কাপড় পরেছেন, বুক অবধি বেঁধে কীরকম অদ্ভুতভাবে পরেছেন। সামনে গুচ্ছের ফুল আর সন্দেশের বাক্স। আর সাধুর একদিকে বুবু আরেক দিকে পুনপুন বসে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছে সাধুটিকে। দিদিভাই প্রণাম করে একধারে বসলেন। বুনবুন এমনিতে খুবই স্মার্ট ছেলে, কিন্তু কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে আজ। দিদিভাই পেছন থেকে টেনে তাকে বসিয়ে দিলেন।

বাবা বললেন—এই আমার শাশুড়িমা, আমার মা-জননী, ঠাকুর, আর এই আমার যমজের আর একটি—বরুণ।

—নমস্কার মা, সাধুটি বললেন, বরুণ? বাঃ বরুণ, মহাসমুদ্রের দেবতা, কই বাবা এদিকে এসো তো!

বুনবুন যেখানে বসেছিল গোঁজ হয়ে বসে রইল। তার ভাল লাগছে না, কেন সে জানে না।

—এইখানে এসো বাবা, আমার কাছে—উনি স্নেহমাখা সুরে বললেন।

বুনবুন আর কী করে? এগিয়ে যায় অগত্যা।

তার মাথায় হাত রেখে সাধুটি গদগদ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তার দিকে। কিছুক্ষণ পরে অমনি বিভোর চেয়ে থেকে বলেন—আমি তোদের ঠাকুর, জানিস তো? ঠাকুর রে!

বুনবুন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছে।

—যা গিয়ে বোস—আবার স্নেহক্ষমা দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

তিন চারজন লোক এসে এই সময়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন ঠাকুর।

দিদিভাই বুনবুনকে একটা মৃদু টান দিলেন। সে উঠে পড়ল। ঘরে লোক গিজগিজ করছে। পুনপুন আর বুবু হাওয়া করে যাচ্ছে।

বাবা উঠে এসে চুপিচুপি দিদিভাইকে কী সব বলছেন, বুনবুন কান খাড়া করে শুনতে পেল—বুঝলেন মা, বরুণ একটা অসাধারণ কৃপা পেল আজ। দীক্ষা নয়, কিন্তু দীক্ষার বাড়া।

দিদিভাই ফিকে মতন একটা হাসলেন। তাড়াতাড়ি করে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন, বুনবুনকে যেন চাবির মতো আঁচলে বেঁধে।

এই তা হলে ভগবান? ভরাট গলার, মিষ্টি কথার, স্নেহমাখা চোখের, কমলালেবু রঙের সিল্কের কাপড় বুকের ওপর গেরো দিয়ে পরা। দাড়ি, লম্বা চুল। এত সহজ ভগবান? ভগবান সম্পর্কে বুনবুনের কোনও ধারণাই ছিল না এতদিন। চার নম্বরে পুজো হত, আরতি হত, পমদিদি করত, সকলেই ঠাকুর নমস্কার করত, সেই ঠাকুর এমন আড়ালে অপেক্ষা করেছিলেন? এখন এমন বলা নেই কওয়া নেই হুপ করে এসে পড়লেন? দিদিভাইয়ের ভাঁড়ার ঘরের কুলুঙ্গিতেও ঠাকুর আছেন, সকাল বিকেল ফুলজল দেন দিদিভাই, এলাচদানা প্রসাদ হয়, কিন্তু সে তো নামঅলা ঠাকুর, লক্ষ্মীনারায়ণ, খুব টুকটুকে সুন্দর, কিন্তু পুতুলের মতো। বুবু-পুনপুনের মতো তার অত ভগবান-ভগবান বাতিক নেই। ভক্তি ভাব একটু কম। একমাত্র বাবার সঙ্গে শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে, হাজারে হাজারে মানুষের কষ্ট আর গোঙানি দেখে সে ভগবানকে প্রাণপনে ডেকেছিল, তখন তার চোখের সামনে আদৌ ভাসেনি চার নম্বরের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভোলা গিরি কী কাঠিয়াবাবার ছবি, বা বারো নম্বরের লক্ষ্মী জনার্দনের মূর্তি। পুজোর সময়ে ঠাকুর দেখতে গিয়ে সে নিশ্চয়ই দুর্গা ঠাকুরকে তাঁর ছেলেপুলে-সহ নমস্কার করে, কিন্তু উনি তো দুর্গাঠাকুর, তেমনই কালী ঠাকুর, সরস্বতী ঠাকুর, আরও কত! কত! কিন্তু ইনি তো একেবারে জ্যান্ত! হঠাৎ তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল দু'জোড়া চোখ। একজোড়া পুনপুনের, আরেক জোড়া বুবুর। তার দিকে আড়ে চেয়েছিল একবার দু'বার। কী যেন ছিল সে চোখে ভয়! দুঃখ? কী? বুনবুন তো ঠাকুরকে দেখতেই ব্যস্ত ছিল, ওদের দিকে ভাল করে দেখেনি তো! হঠাৎ একেবারে হু হু করে মনকেমন করে উঠল তার। যেন তাকে ছিঁড়ে ওদের থেকে আলাদা করে ফেলছে কে! হাত পা কেটে নেওয়ার মতো একটা যন্ত্রণা! এরকম কষ্ট কখনও হয়নি তার। কালো মিনুর জন্যে একটা অন্ধকার কষ্ট হয়েছিল। যে দিন বাড়িতে বর্মার জ্যাঠামশাই এলেন, মাসিমাকে হারানকে কাজের জন্যে চাইলেন, দিদিভাই কড়া গলায় বললেন—না, কিন্তু মাসিমা বললেন—আমায় যেতে দিন মা। খেটে খেতে দিন। আমার আর কী আছে মা যে যাবে! তখন দিদিভাই মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তখন মাসিমা দূর থেকে গড় হয়ে দিদিভাইকে প্রণাম করলেন, হারানকে নিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের পেছন পেছন চলে গেলেন! তখন তার মনটাও মাসিমাদের পেছন পেছন অনেকদূরে চলে গিয়েছিল, ফিরিয়ে আনতে বেশ ক'দিন লেগে গিয়েছিল। কিন্তু এখন যেন তার ছোট্ট শরীরের ওপর দিয়ে করাত চলছে। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে সে পড়ে গেল, খুব লাগল, এবং সে কান্না গিলে নিয়ে শুধু চোখ মুছতে লাগল। দিদিভাই তাকে দু'হাতে ধরে তুললেন,—অমন করে না দেখে নামতে হয়? বোকার মতো করো কেন?

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—মা!

—হ্যাঁ, এই এলুম, তা তুই কি ব্যস্ত?

—এই কাপড় কেচে এলুম। ভোগ রাঁধব।

এবার পিসিমা বেরিয়ে এলেন—আর আমি কী রাঁধব জানেন মা? পিণ্ডি। আমার ছেলেপিলেগুলো খেটে সারা হয়ে যাচ্ছে। ওবেলা রেঁধেছিলুম ভাত আলুভাতে, ডাল আর উচ্ছে চচ্চড়ি, এবেলা ভাত আর নিরমিষ্যি ঝোল। যদ্দিন এই মচ্ছব হচ্ছে বাড়িতে তদ্দিন মাছ পর্যন্ত ঢুকবে না। দুধটুকু মেরে ঠাকুরসেবার ক্ষীর হচ্ছে, আবার চোদ্দো গন্ডার শিষ্যির প্রসাদ হওয়া চাই তো! আপনার মেয়ে আবার ঢং করে আমার জন্যে একবাটি রেখে দিয়েছে। আমার ছেলেমেয়েরা ভাই ভাজ সব মুখ শুকিয়ে বেড়াবে আর আমি তার মধ্যে মিনি বেড়াল, থাবা পেতে দুধ খাবো।

দিদিভাই রান্নাঘরের দোরগোড়ায় পিঁড়ি পেতে বসে পড়লেন, যেন একেবারে বসে পড়েছেন, অনেকক্ষণ পরে বললেন—ছোট দু'টোকে বরং আমি নিয়ে যাই দেবু, পরে রাম এসে জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে যাবে এখন। মা নিশ্বাস ফেলে বললেন—অনুমতি চাই মা, উনি হয় তো নিমরাজি হলেও হতে পারেন, কিন্তু ঠাকুরের অনুমতি ছাড়া এখন এ বাড়িতে কিচ্ছু হবে না।

—তোরা সব কোথায় শুচ্ছিস?

—ছেলেদের ঘরে উনি শুদ্ধু সব ছেলেরা, দু'জন শিষ্য এসেছেন গলসি থেকে, তাঁরা। আমাদের ঘরে আমি, দিদিমণি, বাচ্চারা, আরও দু'জন ওই গলসি আর নদিয়া থেকে এসেছেন। সব শিষ্য। অংশু একা ছাতের ঘরে। দিদিমণির ঘরে ঠাকুর। তেতলার মেয়েদের ঘরে, ওরা তিন বোন, আরও ক'জন অল্পবয়সি মেয়ে।

পিসিমা বললেন—ঢালাও বিছানা হয়েছে ঘরে ঘরে। আমি বলছি মা আপনাকে মেয়েদের মাথাগুলো উকুনে ভরে গেল বলে। এসব গাঁ ঘরের লোক। সব্বাই ওই এক কলঘরে যাচ্ছে। ওপরের কলে ওই মুক্তানন্দ বেম্মচারী একা। মেয়েগুলো ছেলেগুলো জল তুলে তুলে মলো।

—আহ দিদিমণি! মা মৃদুস্বরে বললেন

—বরুণ চলো, দিদিভাই উঠে পড়লেন, পিসিমার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকালেন, খুব আস্তে করে বললেন—এদের একটু দেখবেন।

(ক্রমশ)

ছবি : ঈলীনা বণিক


ছোট, বড় সবার।
সব occasion-এর জন্য বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
95515
Rs 375/-
Genesis 2880
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street 033 22861510/11 Free School Street (Opp. Fire Brigade) 033 22861506

র‍্যান্ডম, যায়িচ্ছে, ভাবনা লোফালুফি

ইংল্যান্ডে দেবেন্দর ঘাই হইচই ফেলে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, মৃত্যুর পর তাঁর দেহটিকে ফাঁকা জায়গায় পোড়াতে দিতে হবে। মানে, চিতা-টিতা সাজিয়ে, ছেলের হাতে মুখাগ্নি নিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে। তিনি হিন্দু, এবং তাঁর ধর্ম বলে, এভাবে শেষকৃত্য না করলে আত্মার শান্তি হওয়া অসম্ভব। উনি চান, তাঁর আত্মা পবিত্র অগ্নির সংযোগে এসে মুক্ত হয়ে আকাশে চলে যাক। মৃত্যুর পর একটা বাক্সের মধ্যে বাণ্ডিল পাকিয়ে শুয়ে থাকাকে তিনি নিতান্ত মর্যাদাহীন কাণ্ড বলে মনে করেন। এই নিয়ে মামলা বহুদিনই শুরু করেছিলেন, সেই ২০০৬ সালে। নিউকাস্‌ল সিটি কাউন্সিল তা সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করে দেয়। সেই বছরেই, আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে তিনি এক শিখ যুবকের মৃতদেহ চিতায় তুলে পুড়িয়ে শেষকৃত্য করেন (উনি একটা ছোট ধর্মসংঘের প্রধান)। পুলিশ পরে খবর পেয়ে গাঁইগুঁই করলেও বিরাট কিছু ঝামেলা করেনি। আফটার অল ধর্মের ব্যাপার। এতে আশকারা পেয়ে উনি নতুন করে মামলা করছেন। গত বছর হাইকোর্টেও তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে গেছে। এবার তিনি পরের ধাপের আদালতে আপিল করেছেন। তাঁর বক্তব্য, খোলা জায়গায় চিতায় মৃতদেহ পোড়াতে দেওয়া হবে না—এই আদেশ দিয়ে এদেশ তাঁর নিজস্ব ধর্ম পালন করতে বাদ সাধছে, এবং তাই তিনি ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যের শিকার। বিচারক বলেছেন, ধর্মটর্ম কিছু নয়, দূষণের বিরুদ্ধে কিছু আইন আছে, যা মানতেই হবে। খোলা জায়গায় মরা মানুষ পুড়বে, এ জিনিসে বিঘ্নিত হবে জনস্বাস্থ্য, জন-নিরাপত্তা, এবং অবশ্যই, জনরুচি।

ব্লগাব্লগি যা শুরু হয়েছে, অনুমেয়। আদ্ধেকেই জিগ্যেস করছে, এই ধর্মবাগীশ ঝামেলাবাজগুলো বারেবারে আমাদের ছিমছাম সভ্য দেশটায় অবান্তর বখেড়া খাড়া করে কেন। আমরা সহনশীল হচ্ছি মানে এরা আমাদের মাথায় উঠে নাচবে এটা কোথাকার নিয়ম? কেউ বলছে, কেন, এই তো ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ ছড়িয়ে পড়ল, মহামারী-তে মরা জন্তুগুলোকে ডাঁই করে তো আমরা খোলা জায়গায় পোড়ালাম, কেউ তো দূষণ নিয়ে কিছু বলেনি। কেউ বলছে, আমিও হিন্দু, ইংল্যান্ডে থাকি, এবং স্পেশাল সমাধিক্ষেত্রে আমার মা-বাবাকে ইলেকট্রিক চুল্লিতে দাহ করেছি, দেশেও তো এ-জিনিস এখন খুব চালু, প্রকাশ্যেই কেন দাহ করতে হবে তো বুঝতে পারছি না। ইংল্যান্ডেরই কোনও হিন্দু সংগঠন বলছে, মৃতদেহে আগুন দেওয়ার পর আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হয় একথা কে বলল? প্রাণত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ফলে মারা যাওয়ার বহু ঘণ্টা পর দেহ নিয়ে কী করা হল তাতে কিছু এসে যায় না। ঝামেলা চলুক, এবং ঘাই-মশাইয়ের এ চিতা-দাবিকে অবান্তর মনে হোক, আমরা বিদ্রুপের সহজ রাস্তা ছেড়ে একটু সরে এসে গালে হাত দিয়ে ভাবি বরং।

ভদ্রলোক কী চাইছেন? তাঁর ধর্মের একটা নির্দিষ্ট আচার মানতে। দেশের আইন কী বলছে? তোমার ধর্ম তুমি পালন করতে পারো ততক্ষণ, যতক্ষণ না তা অন্য মানুষের কোনও বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তোমার ধর্ম যদি তোমায় বলে বছরের তিনটে দিন জনজীবন রুদ্ধ করে দিয়ে সমস্ত রাস্তা আটকে গর্ত খুঁড়ে প্যান্ডেল বানিয়ে অসম্ভব জোরে ঢাক বাজিয়ে সক্কলের ঘুম কেড়ে নেওয়া উচিত, আমার দেশে ধর্মের সে অঙ্গ পালন করতে দেব না। তোমার ধর্ম যদি বলে পাঁচ ওয়াক্ত মাইক বাজিয়ে ভীষণ জোরে সব আওয়াজ ঢেকে দিয়ে ভগবানের বন্দনা করা উচিত, আমার দেশে ধর্মের সে অঙ্গ পালন করতে দেব না। কারণ তাতে অন্যদের অসুবিধে হবে। এখানে তোমার ধর্ম আমার ধর্ম বিভাজন করা হচ্ছে না, আমার ধর্মে যখন ক্রিসমাস পালন হয়, তখন জয় যিশু বলে আমরা কত্তাল বাজাতে বাজাতে রাস্তা দিয়ে যাই না এবং লোকের গাড়িকে 'হোয় হোয় অন্যদিক দিয়ে ঘুরে যা' হাঁকাই না। সবসময় আমরা সামাজিক ও নাগরিক কিছু সভ্যতা মেনে চলি, যার ভিত্তি প্রতিটি ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা ও তার মৌলিক অধিকারগুলোকে শ্রদ্ধা করা। তুমি ধর্ম করছ বলে অন্য লোকে কানে আঙুল দেবে না, নাকে আঙুল দেবে না, চোখে আঙুল দেবে না। প্রকাশ্যে মড়া পোড়ার মধ্যে একটা বীভৎসতা আছে। ধোঁয়া আছে। গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। প্রশ্নটা সভ্যতার। ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য আমাদের দেশে নেই, একইসঙ্গে, ধর্ম করছ বলে মাথা কিনেছ, এই বাড়তি সুবিধেও আমাদের দেশ থেকে পাবে না।

ইংল্যান্ড সত্যিই খুবই শিক্ষিত, সভ্য দেশ। এবং যথেষ্ট সহনশীল। ইউরোপের প্রায় সব দেশই তা-ই। অন্যান্য সংস্কৃতি ভাবনা আচরণকে সেখানে যথেষ্ট সমীহ করা হয়। এবং তা বলে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া হয় না যে আমাদের দেশের মতন ধর্মের নামে অহরহ ছ্যাঁচড়ামি ও মস্তানগিরি ঘটবে। তার কারণ, ওদের প্রধান যত্নের জায়গাটা হুজুগ বা প্রথা নয়, ব্যক্তিস্বাধীনতা। তাই এই চিতা-কাণ্ডে ব্যক্তির আব্দারকে রাষ্ট্র কী যুক্তিতে ব্যাহত করছে? 'তোমার দাবির উদ্ভটত্বে যে চমকে উঠছি হে' বলছে না। বলছে, এটিকে প্রশ্রয় দিলে অন্য ব্যক্তির নাগরিক-অসুবিধে হতে পারে। আচ্ছা, যদি তা না হত? যদি কোনও দূষণ-টুষণের ব্যাপার না থাকত? ধরা যাক একটা ধর্ম বলে, সেই ধর্মাবলম্বীর নগ্ন হয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটা উচিত। ইউরোপ কি সেটাকে মেনে নিত? উঁহু।



তখন বলা হত এটা অশালীন ও অন্যের রুচিকে পীড়া দিচ্ছে। অর্থাৎ, একটা নৈতিক-দূষণ হচ্ছে। এই ধরনের কথা উড়তে শুরু করামাত্রই কিন্তু ব্যাপার আর 'ওঁমাঁ নাঁকে ধোঁয়া ঢুঁকছে'-র মতো সাফ-সহজ থাকবে না। গুচ্ছ গাড্ডার হাঁ খুলে যাবে। কার রুচি? কার নীতি? সেটা অনুযায়ীই চলব, না, নীতিটাকেই, রুচিটাকেই সংশোধন করা উচিত কি না সে বিষয়ে নজর দেব? একলাখ এশীয় হয়তো সাক্ষ্য দেবে, সমুদ্রসৈকতে বিকিনি পরে রোদ-পোয়ানো মেয়েদের দেখলে তাদের রুচিতে বেজায় ঝাঁকুনি লাগে ও এটাকে নৈতিক দূষণ বলেই মনে হয়। তার উত্তরে পাশ্চাত্য কী বলবে? 'অন্যদিকে তাকিয়ে থাকুন মশায়।' কিংবা 'অত যদি শুচিবায়ু, সমুদ্রের ধারে আসবেন না।' সেই নাঙ্গা ধর্মওলাও বলতে পারে, আমি তো কারও ক্ষতি করছি না, বাসে চুপচাপ নগ্ন হয়ে যাচ্ছি, আমার দিকে তাকাবেন না, যদি আপনার খারাপ লাগে। তা হলে? রাষ্ট্রের কী করা উচিত? তাকে জেলে দেওয়া উচিত না তার অধিকারটাকে স্বীকার করা উচিত? খুব সম্ভবত রাষ্ট্র এসময় অধিকাংশের রুচিকে কী আহত করছে আর কী করছে না, সে বিষয়ে নজর দেবে। বা বলবে, যারা আগে থেকে এদেশে আছে, তাদের রুচিকে অগ্রাধিকার দেব। তোমরা পরে এসেছ, তোমরা আমাদের সঙ্গে মানিয়ে নেবে। মহত্তম ব্লান্ডার। গা-জোয়ারির চ্যালাগিরি। একটা লোক একা বলে তো আর সে নিজেকে চেপে, থুড়ে, খর্ব করে বাঁচতে পারে না। দেখতে হবে একা লোকটা ঠিক বলছে না বাকি তেত্তিরিশ কোটি নবুই লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো বাইশ জন লোক ঠিক বলছে। 'ঠিক'-টার ওপর জোর দিতে হবে, সমর্থক-সংখ্যাটার ওপর নয়। সহস্রবার মনে রাখতে হবে 'একটা লোক যদি একরকম বলে, আর বাকি গোটা মানবসভ্যতা যদি উল্টোরকম বলে, সেই একা লোকটাকে জোর করে চুপ করিয়ে দেওয়া ততটাই অন্যায়, যতটা অন্যায় হত, সেই লোকটা যদি কোনওভাবে গোটা মানবসভ্যতাকে জোর করে চুপ করিয়ে দিত।' মেজরিটি অমুক মনে করে, তাই আইনও সেটাই মনে করবে—এ সর্বনাশা যুক্তিতে যে কোনও হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলমানদের কচুকাটা করা উচিত, এবং ইসলাম রাষ্ট্রে হিন্দুদের, কারণ 'অধিকাংশ'-ই তা-ই চায়। আদর্শ রাষ্ট্র কখনও সংখ্যা-তোষণকে নীতি-নির্ধারক করতে পারে না।



লন্ডনের একটি বাসে একবার এক যুবক ও যুবতী উঠছিল, যুবতীটির গলায় বকলশ, এবং তার সঙ্গে আটকানো একটি চেন। চেনের অন্য প্রান্ত যুবকটির হাতে। অর্থাৎ, কুকুরকে যেমন মালিক নিয়ে যায়, যুবতীটিকে যুবক চেন ধরে নিয়ে চলেছে। বাসের ড্রাইভার তাদের উঠতে দেয়নি। এবার, তারা প্রতিবাদ করল। নারীটি বলছে, আমি স্বেচ্ছায় এরকম করে বেরিয়েছি, আমি নিজেকে ওর ক্রীতদাসী বলে মনে করি, এবং এভাবে রাস্তায় বেরোলে আমাদের দু'জনেরই আনন্দ হয়। আমরা তো অন্য কারও ক্ষতি করছি না। নিজেরা পোষ্য ও মনিবের মতো চলেছি। বাসে উঠতে দেবে না কেন? ড্রাইভারটি শেষে 'ব্রেক কষলে চেন-এ টান পড়ে যুবতীটি গলায় আঘাত পেতে পারে' এই যুক্তি পেশ করে কোনওমতে রেহাই পায়, নইলে বাস কোম্পানিকে মোটা ক্ষতিপূরণ দিতে হত। আসল কথাটা কী? ওইভাবে ওদের দেখে ড্রাইভারটির, এবং নিঃসন্দেহে অন্য অনেকেরই, মূল্যবোধে আঘাত লেগেছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের মূল্যবোধে আঘাত লাগলেই যদি ব্যক্তিকে অধিকার-বর্জন করে তার মূল্য চোকাতে হয়, তা হলে স্বৈরাচার থেকে তা জাস্ট এক-চৌকাঠ দূরত্বে থাকে। একটি মেয়ে তার প্রেমিকের হাত ধরে কম্পাউন্ডে ঢুকতে গেলেও দারোয়ানের মূল্যবোধে ঘা লাগতে পারে। এতক্ষণে কেউ কেউ বলছেন, দাঁড়াও দাঁড়াও, কী তত্ত্ব ফলাচ্ছ? চেনবাঁধা মেয়েটি নিজে যা-ই মনে করুক না কেন, তাকে চূড়ান্ত অপমান করা হচ্ছিল, তাকে মানুষের পর্যায় থেকে অধীনস্থ জন্তুর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হচ্ছিল। এবং পুরুষ-শাসনের অকথ্য নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন ছিল ওই ছেলেটির হাতে ধরা চেনপ্রান্তে। নামিয়ে দিয়েছে ভাল করেছে। এ জিনিস অ্যালাউ করা যায় না কি? বেশ। একটা বাসে এক নারী যদি একা একা যায় হাতে দু'টো হাতকড়া পরে? বা, এগজ্যাক্টলি হাতকড়া না-হলেও, তারই দ্যোতক দু'টো লোহা পরে? যাকে সে বলে 'নোয়া'? আর মাথার মাঝখানে রক্তের ধারার চিহ্ন হিসেবে সে যদি এঁকে নেয় কিছুটা দগদগে লাল রেখা? সে যে এক পুরুষের শাসনের সম্পূর্ণ অধীনা এবং তা হয়ে গর্বিতা, এর জ্বলজ্বলে বিজ্ঞাপন যদি সে সানন্দে ধারণ করে? তাকে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া যাবে? যদি বাসের অধিকাংশ যাত্রীর মূল্যবোধের সঙ্গে তা মানানসই না হয়, তা হলেও? আমার ঘাড়ে কিলবিলে কাঁকড়া বিছের উল্কি, কিংবা বাইসেপে টিকটিকির, এ তোমার রুচিকে আঘাত করতে পারে, কিন্তু তার বশে তুমি আমাকে চপেটাঘাত করতে পারো না। তোমার অ-পছন্দসই অন্যের অভ্যাসকে—শ্রদ্ধা করতে হবে না, ও তো খুব বড়সড় ব্যাপার—সহ্য করতে শেখাটাই আসলে সহনশীলতা।

এবার স্বল্প চোখ ফেরানো যাক ফরাসি রাষ্ট্রপতি সারকোজি-র দিকে, যিনি বলেছেন তাঁর রাষ্ট্রে মেয়েরা বোরখা পরলে, তা ফ্রান্সের ব্যক্তিস্বাধীনতা বিষয়ক ধারণাকে আঘাত করে। মুসলমানরা উত্তরে বলেছেন, বোরখা পরতে না-দিলে, তা তাঁদের ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণাকে আঘাত করে। এবার? বোরখা পরলে কোনও নাগরিক-অসুবিধে হচ্ছে না, শুধু পাশ্চাত্যের চোখে তা উদ্ভট দেখাচ্ছে, এবং মনে হচ্ছে নারীটির পক্ষে এ-ধরনের পোশাক অবমাননাকর। নারীটির যদি মনে হয়, এই পোশাকে তিনি স্বচ্ছন্দ? বা, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ? বা, সিম্পলি, খুব প্রীত? এবার তাঁকে জোর করে সেই পোশাক না-পরতে দেওয়াই তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয় কি? আমার শরীর, আমার জীবন, আমার আবরণ, আমার আভরণ, এখানেও রাষ্ট্র তার সম্মাননীয় নাক গলিয়ে দিতে পারে কি? তা করে সে ইউরোপসুলভ

পরমতম গণতন্ত্রের ফোয়ার ছোটাচ্ছে না আদতে একটি সর্বনিয়ন্ত্রক মহা-খাণ্ডার গুন্ডা হয়ে উঠছে? ব্যক্তি ব্যক্তি বলে এত চেঁচাবার পর আমার একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে পড়ে সে কোনটা ভাল-ব্যক্তিগত আর কোনটা খারাপ-ব্যক্তিগত তার ওজন গিলিয়ে দিচ্ছে কেন? রাষ্ট্রের খবরদারি আমি কতটা অবধি সহ্য করব এই ভেবে যে সে আমার ভাল-র জন্য গার্জেনি করছে, আর কখন বুঝব যে সে আসলে আমার গলা টিপে ধরছে? রাষ্ট্রের তাবৎ মূল্যবোধ ও ধারণার সঙ্গে আমার মূল্যবোধ ও ধারণাগুলি সর্বসম করে তোলার দায় আমি বহন করব কেন? সারকোজি-র নীতিসূত্রকে আরেকটু সম্প্রসারিত করলে কি তিনি কালকে বলতে পারেন না, হাতে গোমেদ বা পোখরাজ বসানো আংটি পরলে আমাদের যুক্তিবাদ-ভিত্তিক সভ্যতা-ধারণা চিড় খাচ্ছে, ফলে ও-জিনিস ব্যান? পরশু বলতে পারেন না, যাদের বাড়িতে আইফেল টাওয়ারের পাঁচ ইঞ্চি রেপ্লিকা ফায়ারপ্লেসের ওপর সাজানো নেই তারা দেশ থেকে বেরিয়ে যাও? তরশু : গোলাপি রঙের অন্তর্বাস পরলেই বেত, পুলিশ চেক করবে মোড়ে মোড়ে (মেয়েদের চেক করবে মেয়ে-পুলিশ, সে-ব্যাপারে ভদ্রতার ত্রুটি নেই)। এবং চরশু কোনও এক খঞ্জ রাষ্ট্রপতি এসে অ্যানাউন্স করতে পারেন, এক পায়েই যখন কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় তখন বাড়তি একটি পা ব্যবহার নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও সুতরাং অশালীন, অতএব কসাইরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে ও আপনারা সহযোগিতা করুন!

এবার ক্যামেরাটাকে টানতে টানতে আনুন রাষ্ট্রের পাশে। এবং অবলোকন করুন। সে তা হলে ব্যক্তির সমস্ত বৈচিত্র, অন্যরকমত্ব, আশ্চর্যতা, নিজত্ব সহন করতে বাধ্য, যতক্ষণ না তা অন্যের অধিকারকে বিঘ্নিত করছে? এমনিতে রাষ্ট্র শুধু দেখবে ট্রাফিক সিগন্যাল ঠিকঠাক চলছে কি না আর পকেটমারি কমছে কি না? পার্ক পরিষ্কার রাখবে এবং জল-সাপ্লাই বিরতিহীন? রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি তার নিজের পরিসরে যা-ই করুক না কেন, যা-ই, যা-ইচ্ছে, যেমন খুশি, গদগদে আবেগদীপ্ত ও চলতি-যুক্তি রহিত, যতক্ষণ তা সেই ব্যক্তিটিকে ছাড়া অন্য কাউকে আঁকড়ে না-ধরছে, ততক্ষণ রাষ্ট্রের স্পিকটি-নট দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া আর কিচ্ছু করার অধিকার নেই? যদি সেই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত (রাষ্ট্রের মতে) ব্যক্তিটির সমূহ ক্ষতি করে, তবুও? ধরা যাক, একটি ধর্মসম্প্রদায় ঠিক করল, তারা নীচের ঠোঁটে ক্যাকটাসের কাঁটা বিঁধিয়ে রাখবে, এতে যে কষ্ট হবে, তা তাদের জগতের নিত্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। ঈশ্বরের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। এবার, একের পর এক লোকের ঠোঁটে প্রবল ইনফেকশন হতে লাগল এবং প্রচণ্ড যন্ত্রণা। কিন্তু ব্যক্তি যন্ত্রণা সহ্য করতে রাজি, নিজের চিকিৎসার খরচ সে নিজেই বহন করছে, ঠোঁট ফুলে ঢোল হয়ে তার কথা বলার বা চুম্বন করার বা ভাত খাওয়ার ক্ষমতা অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাতেও তার কোনও আপত্তি নেই। সে নিজের মতো করে নিজের জীবনটা বুঝে নিচ্ছে। কণ্ঠনালীতে ফুটো করে সুরুয়া ঢালছে। রাষ্ট্রের কাজ কী? শুধু হাসপাতালে ও ওষুধের দোকানে ঠোঁটের মলম ঠিকঠাক সাপ্লাই হচ্ছে কি না সেটুকু দেখা? অধর মানুষের কত জরুরি অঙ্গ এ বিষয়ে কিছু জনস্বার্থ-মার্কা বিজ্ঞাপন টিভিতে সর্বোচ্চ-টিআরপিওলা অনুষ্ঠানের ব্রেকে তিনবার দেখানো? না কি, ওদের গিয়ে বলা, এই ভাই, এটা করবেন না। এটা ভাল না। শেষ কাজটা করলেই তো সে অপরাধী হয়ে যাচ্ছে, ব্যক্তিবৃত্তে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে হিটলারধর্মী সুরে বাজছে। ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে দেঁড়েমুশে নিজ ক্ষতি করলে রাষ্ট্র কী করবে? লীলায়িত শ্রাগ করে বলবে, থাউকগা? না কি তাকে কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দেবে, মগজ-জাগ্‌ল করবে? আরও : রাষ্ট্র কি সত্যিই এতটাই মুখ্যু সেজে ঘাড় ঘুরিয়ে দূরমাঠের নাগরদোলার দিকে তাকিয়ে থাকবে যে আদৌ বুঝতে পারবে না কোনটা ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকাশ আর কোনটা আসলে গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের বা সংঘের



কড়াক্কড় শেকল-অনুশাসন পালন? কোনটা নিজের পছন্দ আর কোনটা না-করলে স্বজনেরা ঘৃণার চোটে ভূত ভাগিয়ে দেবে সেই ঠেলায় পড়ে মেনে নেওয়া? কোনটা শুধু প্রথামাফিকতার বেদিতে আত্ম-উৎসর্গ? ছোট সমষ্টির মস্তানি তা হলে মেনে নেবে রাষ্ট্র, যাতে তার নিজ-ব্যবহারে কক্ষনও মস্তানির একটি ফোঁটাও না গুলে যায়?

আচ্ছা, ফের একটি গল্প কল্পনা করা যাক। একটি জাত গিয়ে আরেকটি দেশকে অধিকার করল, যে-দেশের সমাজ, সংস্কার, ধর্ম, আচার, বিচার, চিন্তা, শিক্ষা—কিচ্ছু বিষয়ে কিচ্ছু বোঝার কোনও ধরতাই-কাঠিই তার নেই। এদেশের মানুষগুলো দেখতে অদ্ভুত, খায় অদ্ভুত, পরে অদ্ভুত, এবং এতটাই অদ্ভুত ভাবনা ভাবে, শাসক-জাতটির সভ্যতা-ভদ্রতা সম্পর্কে সব ধারণাই তাতে আহত হয়। তারা এদের ওয়েভলেংথ পাকড়ে ওঠার কিনারাই পায় না। এই দেশের নেটিভদের অধিকাংশ যে-ধর্ম মেনে চলে, সেই ধর্মে একটা অনুশাসন আছে, স্বামী মারা গেলে তাকে যখন চিতায় পোড়ানো হবে, তার স্ত্রীকেও সঙ্গে তুলে দেওয়া হবে ও জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে। ব্যাপারটা ওই শাসকদের নিষ্ঠুর বা অমানবিক মনে হতে পারে, কিন্তু ধর্মগোষ্ঠীটির প্রায় প্রত্যেকেরই এই প্রথায় খুব সায়, তারা ঢাকঢোল বাজিয়ে সাড়ম্বরে এ অনুষ্ঠান উদযাপন করে, এবং যে মেয়ে চিতায় উঠছে, সেও মনে করে, এই দহন তাকে অপূর্ব মহিমা প্রদান করবে। এতে শাসকদের খুব খারাপ লাগে, তারা ইতস্তত 'এটা না করলেই নয়?' টাইপ কথাবার্তাও বলে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। অন্যের বিশ্বাসে গুণছুঁচ ফুটিয়ে দেওয়ার অধিকার তো তাদের নেই। একদিন, নেটিভদের মধ্যে থেকে একটি লোকের নেতৃত্বে কিছু মানুষ শাসকদের এসে বলল, স্যর, এ প্রথাটা বন্ধ করুন, নিরীহ মেয়েগুলো মারা যাচ্ছে। এবার শাসকদের, অর্থাৎ কিনা রাষ্ট্রের, কী কর্তব্য? তারা যখন হইহই



করে গিয়ে এই বউ-পোড়ানোর সানন্দ অনুষ্ঠানে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলে দাঁড়াচ্ছে ও বউটিকে প্রশ্ন করছে : সে সহমৃতা হচ্ছে স্বেচ্ছায় না অন্যদের জোরাজুরিতে, তখন সে বালিকা মোমের শিখায় হাতের তালু ধরে রাখছে, চড়চড় করে তার মাংস পুড়ছে, তবু সে এক ইঞ্চিও সরাচ্ছে না, বরং সতীত্বের গরবে গরবিনি হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে অপার্থিব মুচকি হাসছে। তা হলে তো এবার মানে মানে সরে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই? কারণ এই অভ্যাস অন্য কারও কোনও অধিকারকে বিঘ্নিত করছে না (দূষণ-টুষণ তখনও পৃথিবীতে আসেনি), রাস্তাঘাট ব্লক করছে না, যার ক্ষতি হচ্ছে (অর্থাৎ প্রাণ যাচ্ছে, যেটা, শাসকদের লালমুখো যুক্তিবুদ্ধি অনুযায়ী, ক্ষতি। কিন্তু এই ধর্মের লোকের কাছে, বৃহত্তর লাভের জন্য সামান্য ত্যাগ), সে সেই ক্ষতিতে সম্পূর্ণ সম্মত ও সুখী। ফলে উদগ্রীব উড-বি-সতী কোনও মেয়ে যদি বলে, আমার ব্যক্তিগত পরিসরে, আমার একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে, আমার নিজের জীবন আমার নিজের প্রেম আমার নিজের শরীরবেদনা ও আমার নিজের পরলোকভাবনার বৃত্তে তুমি নাক গলাবার কে হে, তোমার মতানুযায়ী যা অমানবিক আমার মতানুযায়ী তা স্বর্গীয়, এবং তোমার-আমার মূল্যবোধ টায়ে-টায়ে মিলিয়ে দেওয়ার কোন দায়ই আমি অনুভব করি না, তা হলে রাষ্ট্রের কোনও অধিকার আছে কি, গায়ের জোরে তার সতী হওয়া রদ করার? না কি রাষ্ট্র কেস বাই কেস আলাদা করে ভাবী-সতীকে ডেকে নিয়ে তিনদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে চাইবে মেয়েটি একথা বলছে ড্রাগ বা আলট্রা-শোক বা হিস্টিরিয়া বা মগজ-ধোলাইয়ের প্রভাবে কি না? ততক্ষণে তো স্বামীর মড়া পচে যাবে এবং অন্যের দুর্গন্ধ না-পাওয়ার অধিকার বিঘ্নিত হবে। (সত্যি সত্যি অবশ্য বেন্টিঙ্ক বা হিঁদুবাঁউন কেউই মেয়েদের মত জিগ্যেস করেননি, মেয়েদের তখন মতামতবিশিষ্ট প্রাণী ভাবা হত না, কিন্তু যুক্তিটা খোলতাই, এ-যুগীয় ও এই প্রবন্ধ-সমঞ্জস হবে বলে লিখছি। লড়াইটা আদতে হয়েছিল 'আমাদের ধর্মে আছে' আর 'ধর্মে থাক, তবু খুন করতে পাবি না'-র মধ্যে)। না কি এখানে রাষ্ট্র বড়জোর যা করতে পারে তা হল, নেটিভদের বোঝানো, বারবার আলোচনা করা, বলা : ভাইসকল, আমরা জানি আমাদের সঙ্গে তোমাদের মেলে না এবং আমরা তোমাদের বুঝি না, কিন্তু আমাদের কেমন যেন মনে হচ্ছে মরে যাওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকা একটা লোকের পক্ষে ভাল, যদি প্লিজ একটু কনসিডার করো? এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কী করেছিল আমরা জানি। তারা নিজেদের মূল্যবোধ ওই গোষ্ঠীর ওপর গায়ের জোরে চাপিয়ে দিয়েছিল। হিন্দুরা সভা গড়ে তখনকার দিনে হাজার তিরিশেক টাকা তুলে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিল-এ এই আইনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল, কিন্তু সেখানেও এই 'নিজেদের মতো করে জীবন বা মরণ যাপনের অধিকার'কে মানা হয়নি। এবং কেউ কেউ, সত্যি বলতে কী, সেজন্য রাষ্ট্রের কাছে কৃতজ্ঞও।

অর্থাৎ প্রশ্নগুলো হাড়-শক্ত, উত্তরও অজানা। রাষ্ট্রকে অধিকার হরণের অধিকার দিলে ব্যক্তির ত্যানা সরে যায়, ব্যক্তিকে নিজবাঁশের লাইসেন্স দিলে নির্বোধের সিলমোহর-স্থাপনের রবরবা রাষ্ট্র হয়ে যায়। কেয়া পন্থা? যে কোনও একটা পক্ষের যুক্তিকে একটু অতিরেক মিশিয়ে টেনে নিয়ে গেলেই সেটা অ্যাবসার্ড শিখরে পৌঁছে যাবে। ব্যাপারটা প্রায় রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচার বনাম ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার—এই ক্রীড়া-ফিক্সচারে গিয়ে পড়ছে। এভাবেও জীবন চলা মুশকিল, ওভাবেও। কোথায় লাইন টানবে, কত অবধি ঘোড়া ছোটাতে দেওয়ার পর ব্যারিকেড টাঙাবে, সতেরোশো স্তরের যুক্তিবিন্যাসের কোন রঙে পাঞ্জা রাঙাবে, এ এক চিরকালীন ফোঁড়া। আদুড় করেই রাখো আর পুলটিশ দিয়েই ঢাকো, টনটনিয়ে উঠবেই। ফলে, সমস্যাগুলো নাকের ডগায় ঝুলিয়ে আজকের মতো ঝাঁপ বন্ধ করা গেল। সমাধান? ও, ইয়ে, এ সপ্তাটায় তো বিজি আছি, পরে একদিন বসে নেওয়া যাবে'খন।

ক্ষমা করো হে প্রভু

রূপক সাহা

দলিতদের বস্তি থেকে ফেরার পর ভাগবত মন্দিরে যায় গোরা। গায়ে হালকা জ্বর। মন্দিরের মোহান্তজি গলায় রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। কিছুক্ষণ পর গোরা ফিরে যায় বাড়িতে। সেখানে তার সঙ্গে থাকে পাড়ার ছেলে মুকুন্দ। তাকে নিয়ে ইদানীং সে ভারি চিন্তিত। অনেক পরে মুকুন্দ বাড়ি ফিরলে, রাগের মাথায় তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে গোরা।

৫

বেহালার এই বাড়িতে জয়দেব ছাড়া এখন আর কেউ নেই। থাকার মধ্যে এক আছে ওর মা। দিন দশেক আগে মা দেশের বাড়ি ঝাড়গ্রামে গিয়েছে। দেশে ওদের কিছু দোফসলা জমি আছে। মা গিয়েছে বর্গাদারদের কাছ থেকে ফসল বুঝে নিতে। জমিতে যা ধান হয়, তাতে সারা বছর ওদের আর চাল কিনতে হয় না। কাল রাতে মা ফোন করে বলল, এবার আলুর চাষ করাবে। চাষের ব্যাপারে আগ্রহ নেই জয়দেবের। মায়ের ওপরই ওসব ছেড়ে দিয়েছে। মা না থাকায়, এই ক'টা দিন ও নিজের ইচ্ছেমতো চলছে। কানের কাছে কেউ এখন আর বলার নেই, 'বিয়েটা এই বেলা সেরে ফেল বাবা।'

গবেষণার কাজ শেষ না করা পর্যন্ত বিয়ে করার ইচ্ছে নেই জয়দেবের। মাকে সেকথা বলেওছে। কিন্তু মা ইদানীং একটু অবুঝ হয়ে গিয়েছে। প্রায়দিনই কোনও না কোনও মেয়ের ছবি এনে দেখিয়ে বলে, 'দেখো তো বাবা, এই মেয়েটাকে পছন্দ হয় কি না?' রোজই জয়দেব না করে দেয়।

বাড়িতে মা না থাকলে জয়দেব নিজেই ব্রেকফাস্ট তৈরি করে নেয়। সেইসময় ওর টিভিতে খবর শোনার অভ্যেস। সারাদিন টিভি দেখার আর সুযোগ পায় না। পরে টিভির সাউন্ড কমিয়ে দিয়ে, চট করে ও খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নেয়। আজ কাগজের বদলে সুশোভনদার প্যাকেট-টা নিয়ে বসল জয়দেব। কাল দোকানে বসে সুশোভনদার চিঠিটা পড়ার সময় পায়নি। ছবি আর লেখাটা দ্রুত ও প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তবে তার আগে ছবি ও লেখাটার একটা কপি জেরক্স করে রেখেছিল। আজ সোফায় বসে ও চিঠিটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল।

'ভাই জয়দেব,

আজ বিকালে তোমাকে মিউজিয়মের গেটে আসতে বললাম। অথচ তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। এই কারণে প্রথমেই তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু বাধ্য হয়েই আমাকে এটা করতে হল। মিউজিয়মের কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই একটা দুষ্টচক্র আমার ওপরে নজর রাখছে। আমি কার সঙ্গে দেখা করছি, কে আমার সঙ্গে দেখা করছে, সব তাদের নখদর্পণে। তোমার সঙ্গে যে আমার একটা ভাল সম্পর্ক আছে, তা ওই দুষ্টচক্রের লোকেরা জানে। আজ মিউজিয়মে এসে টের পেলাম, তোমাকে যে আমি বেলা তিনটের সময় আসতে বলেছি, সেটা এরা জেনে গিয়েছে। কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছিল, তোমাকে যদি আমি ভিতরে নিয়ে আসতাম, তা হলে এরা তোমাকে বিপদে ফেলত। প্যাকেটের ভিতর যে ছবিটা পাঠাচ্ছি, সেটা তোমাকে দিলে, তুমি বেরিয়ে যাওয়ার সময় এরা গেটে তোমাকে আটকে দিত। এবং সেইসঙ্গে জাদুঘরের অমূল্য জিনিস পাচারের অভিযোগে পুলিশ তোমাকে থানায় টেনে নিয়ে যেত। বিনা দোষে তোমার খুব বদনাম হয়ে যেত।'

এই পর্যন্ত পড়ে জয়দেব প্যাকেট থেকে ছবির জেরক্স কপিটা বের করে আনল। খুব ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার পর ও বুঝতে পারল, এটা অরিজিনাল ছবির ফোটোকপি। কিন্তু এত ভাল কপি যে, ছাপাতে কোনও অসুবিধে হবে না। ছবিতে কোনওরকম গ্রেন আসবে না। সুশোভনদা কাগজে নিয়মিত লেখা দেন বলেই, এত ভালভাবে ছবিটা কপি করে পাঠিয়েছেন। ছবির বিষয়বস্তু হল, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শুয়ে আছেন। তাঁর পায়ের সামনে হাতজোড় করে বসে আছেন রাজবেশে একজন। ইনি নিশ্চয়ই গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র। মহাপ্রভুর আশেপাশে তাঁর কয়েকজন শিষ্য বসে। ছবিটা রঙিন। প্রায় পাঁচশো বছর আগে আঁকা। তাও বিবর্ণ হয়নি দেখে জয়দেব একটু অবাকই হল। ও ফের চিঠি পড়ায় মন দিল।

'জয়দেব, প্যাকেটের ভিতর পাঠানো এই ছবিটা আমি উদ্ধার করেছি মিউজিয়মের স্টোর রুম থেকে। অনাদরে পড়েছিল একটা কাঠের বাক্সের ভিতরে। এই কারণেই ছবিটা নষ্ট হয়নি। একেবারে অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। কারা এই ছবিটাকে মিউজিয়মে দিয়ে গিয়েছিল, কবে দিয়ে গিয়েছিল, সেই তথ্যটা অনেক কষ্টে আমি উদ্ধার করেছি। পরে জানতে পারলাম, ছবিটা ক্যাপ্টেন রবার্ট কুক নামে এক ইংরেজের হেফাজতে ছিল। ১৮৯৬ সালে তিনি দেশে ফিরে যাওয়ার সময় ছবিটা মিউজিয়মের সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দেন। তৎকালীন কর্তারা এই ছবিটার ঐতিহাসিক মূল্য



সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। মিউজিয়মেও তখন চিত্র প্রদর্শনের কোনও গ্যালারি ছিল না। সেই থেকে ছবিটা বাক্সবন্দি হয়েই ছিল।

জাদুঘরের পুরনো নথি থেকে জানতে পারলাম, অনুরূপ বিষয় নিয়ে আঁকা আর একটা ছবি ওড়িশার রাজাদের কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবে পেয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজদৌল্লার পার্ষদ জগৎ শেঠ। এখন সেগুলো জগৎ শেঠের বংশধররা সযত্নে রেখে দিয়েছেন কোনও ব্যাঙ্কের লকারে। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মপঞ্চশতবার্ষিকীতে সেই ছবিটার দাম উঠেছিল এক কোটি টাকা। ছবিটার এত দাম ওঠার কারণও আছে। কেননা, মহাপ্রভুর জীবিত অবস্থায় তাঁকে দেখে আঁকা, ওটাই প্রথম ছবি। সুখের কথা, জগৎ শেঠের উত্তরাধিকারীরা প্রলোভনে পা দেননি। ছবিটা তাঁরা বিক্রি করেননি।

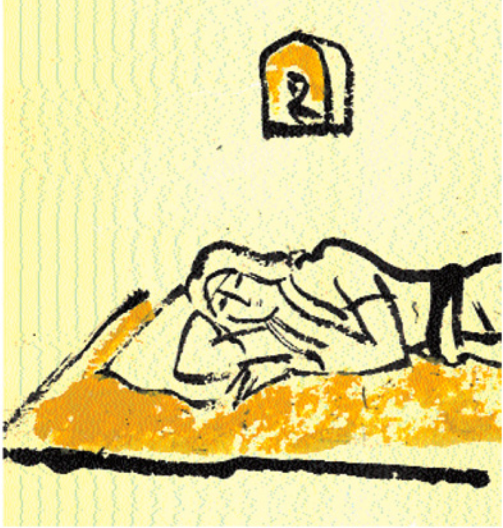
ভাই জয়দেব, তুমি মহাপ্রভুর মৃত্যুরহস্য নিয়ে গবেষণা করছ বলেই আমি নিশ্চিত, ছবিটার গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারছ। মহাপ্রভুর যেদিন মৃত্যু হয়, এই ছবিটা তার দু-তিনদিন আগে আঁকা। ভাল করে লক্ষ করলেই তুমি দেখতে পাবে, শায়িত মহাপ্রভুর পায়ে একটা ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কে এই ছবিটা এঁকেছিলেন? মোঘল আমলে হিন্দুদের মধ্যে প্রতিকৃতি আঁকানোর চল ছিল না। মানে...জীবিত অবস্থায় শিল্পীদের দিয়ে নিজের ছবি আঁকানোর কথা কেউ ভাবতেনই না। ছবি আঁকানোর বিলাস ছিল রাজা আর জমিদারদের মধ্যেই। তা হলে মহাপ্রভুর এই ছবিটা আঁকার দায়িত্ব কে দিলেন ওই শিল্পীকে? প্রশ্নটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। সেইসময় যবন অর্থাৎ মুসলিম শিল্পীরাই ধনী ব্যক্তিদের ছবি আঁকার আমন্ত্রণ পেতেন। তা হলে কি মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে কোনও যবনশিল্পী ছিলেন? যতদূর জানি, জীবনের শেষদিকে, মহাপ্রভুকে ঘিরে রেখেছিলেন তাঁর পঞ্চসখা। এঁদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন গৌড়ের, বাকিরা সবাই ওড়িশার। এঁদের মধ্যে কেউই যবন ছিলেন না। তা হলে?'

চিঠি থেকে মুখ তুলে জয়দেব এবার গভীর চিন্তায় ডুব দিল। মহাপ্রভুর জীবনের শেষদিকে তাঁর কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে নিয়ে ও গবেষণা করেছে। যবন হরিদাসের কথাও ও জানে। কিন্তু তিনি শিল্পী ছিলেন না। ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ও। এবং বোঝার চেষ্টা করল, মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্যের কোনও সূত্র ছবিতে লুকিয়ে আছে কি না। হঠাৎ জয়দেবের মনে হল, রথযাত্রার সময় মহাপ্রভু রাস্তায় ইটের টুকরোর আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এটা জানতে পেরেই সম্ভবত রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে একা দেখা করতে এসেছিলেন। ওইসময় তিনি পুরীতেই ছিলেন। সুশোভনদা লিখেছেন, জগৎ শেঠের বংশধরদের জিম্মায় যে ছবিটা আছে, সেই ছবিটা শিল্পীর আঁকা প্রথম ছবি। তা হলে কি এটা দ্বিতীয় ছবি? নাকি দু'টো ছবি হুবহু এক? প্রথম ছবিটা নিশ্চয়ই ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে। জয়দেব ঠিক করে রাখল, পরে ওই ছবিটা দেখে নেবে। মনটাকে সরিয়ে এনে ফের ও চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

সুশোভনদা লিখেছেন, 'প্রশ্নটা আমাকে তাড়া করে বেরাচ্ছিল। কিন্তু উত্তরটা আমি খুঁজে পাইনি। কী মনে হল, ছবিটা দশগুণ ব্লো আপ করে পর্দায় ফেললাম। তন্নতন্ন করে খোঁজার পরই উত্তরটা পেয়ে গেলাম। শিল্পীর নাম এক কোণে লেখা ছিল। গোকুলানন্দ দাস। এত ছোট অক্ষরে লেখা, সাদা চোখে দেখা সম্ভবই নয়। এটা নিশ্চয়ই শিল্পীর সন্ন্যাসোত্তর জীবনের নাম। হয়তো শিল্পী চাননি, তাঁর নামটা কেউ জানুক। কারণটা তুমি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ! আসল নামটা জানালে তিনি ক্ষমতাশালী অনেকের রোষে পড়তেন। তা সত্ত্বেও, আরেকটা ক্লু তোমাকে দিই। এই গোকুলানন্দ দাস পরপর চারটে ছবি এঁকেছিলেন। দু'টো ছবি মহাপ্রভুর জীবিত অবস্থায়। বাকি দু'টো তারপরে। আমার মনে হয়, ওই শেষ দু'টো ছবি পাওয়া গেলে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করা সম্ভব হবে। তুমি হয়তো জানতে চাইবে, বাকি দু'টো ছবির হদিশ আমি কী করে পেলাম? তার কারণ হচ্ছে, তোমার কাছে যে ছবির কপিটা পাঠাচ্ছি, তাতে লেখা আছে গোকুলানন্দ দাস ২-৪। অর্থাৎ চারটে ছবির সিরিজে এটি দ্বিতীয় ছবি।

ভুবনেশ্বরে আমার খুব বিশ্বস্ত এক বন্ধু আছেন। তিনি কলা গবেষক। নাম নরহরি মহাপাত্র। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে তাঁকে আমি মেল করি। দেখলাম, জগৎ শেঠদের হেফাজতে থাকা ছবিটার ইতিহাস উনি জানেন। উনি লিখেছেন, 'আপনার ধারণাই ঠিক। গোকুলানন্দ দাসের আসল নাম জামিল ফেরদৌস। তিনি মোঘল দরবারের একজন নামী চিত্রকর ছিলেন। দেশভ্রমণ করতে করতে একবার তিনি শ্রীক্ষেত্রে যান। সেখানে মহাপ্রভুকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। দিল্লিতে ফিরে না গিয়ে ফেরদৌস শ্রীক্ষেত্রেই থেকে যান। এবং ধর্মান্তরিত হয়ে বসবাস করতে থাকেন সেখানে। ফেরদৌস ছিলেন বলশালী ব্যক্তি। ফলে তিনি মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠদের একজন হয়ে যান। তিনি যে চিত্রকর, একটা সময় এটা জানতে পারেন মহাপ্রভুর শিষ্যরা। তাঁদের প্রেরণাতেই প্রথম দু'টো ছবি ফেরদৌস আঁকেন।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর থেকে গোকুলানন্দের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শোনা যায়, তিনি সেই রাতেই গোপনে বৃন্দাবনে চলে যান। সেখানে বাকি দু'টো ছবি আঁকেন। এই দু'টো ছবির কথা জানা যায়, মহাপ্রভুর গৌড়ীয় শিষ্যদের কাছে। কারণ ছবি দু'টো নাকি মহাপ্রভুর হত্যাকাণ্ডের প্রামাণ্য দলিল। এবং সযত্নে রাখা ছিল বৃন্দাবনের গোবিন্দ মন্দিরে। নরহরি মহাপাত্র লিখেছেন, শেষ দু'টো ছবি কোথায় আছে, তা তিনি জানেন। তবে তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। জয়দেব, ওই ছবি দু'টোর টানেই আমি বেরিয়ে পড়েছি। আমি উদ্ধার করবই। আমার বয়স হয়ে গিয়েছে। যে কোনওদিন মারা যেতে পারি। ছবি দু'টো উদ্ধার করতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাতেও পিছব না। কোথায় যাচ্ছি, তা নিজেও জানি না। যে দুষ্টচক্রের কথা চিঠির গোড়াতে লিখেছি, তারা সম্ভবত আমাকে ফলো করছে। জানি, তোমার কাগজে এই লেখাটা প্রকাশিত হওয়ার পর ওরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। তা সত্ত্বেও, সুযোগমতো তোমার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করব। ভাল থেকো। ইতি, সুশোভনদা।' চিঠিটা পড়ে জয়দেব অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। অনেকগুলো প্রশ্ন ওর



মনে একসঙ্গে ভিড় করে এল। ছবিটার কথা কি মিউজিয়মের আর কেউ জানেন? বাকি দু'টো ছবির খোঁজে সুশোভনদা কোথায়ই বা গেলেন? কেন সুশোভনদার পিছনে দুষ্টচক্রটা লেগে রয়েছে? কী তাদের স্বার্থ? জামিল ফেরদৌসের আঁকা ছবিটা নিয়ে যে দিনকাল-এ একটা লেখা বেরেচ্ছে, সেটা কি দুষ্টচক্র জানে? সবশেষে যে প্রশ্নটা জয়দেবকে কুরে কুরে খেতে লাগল, সেটা হল, এখন ওর কী করা উচিত? একটা একটা করে প্রশ্নগুলোর উত্তর, ও খুঁজতে লাগল।

ছবিটার কথা মিউজিয়মের আর কেউ জানেন না, এটা কোনও মতেই হতে পারে না। সুশোভনদা তো আর মিউজিয়মের স্থায়ীকর্মী নন। উনি ফিজিকাল ভেরিফিকেশনের জন্য সাময়িক দায়িত্ব পেয়েছেন মাত্র। কাজ করতে গিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে নিশ্চয়ই ওঁকে স্থায়ীকর্মীদের মুখ চেয়ে থাকতে হয়। সুশোভনদা ছবিটার ফোটোকপি করিয়েছেন, দশগুণ ব্লো আপ করে পর্দায় দেখেছেন, লাইব্রেরিতে গিয়ে খোঁজখবর করেছেন, পুরনো রেজিস্টার যদি থেকে থাকে, তা দেখেছেন—সর্বোপরি কুরিয়ার সংস্থার লোককে দিয়ে প্যাকেট-টা ওর বাড়িতে পাঠিয়েছেন। কথায় কথায় সুশোভনদা একদিন বলছিলেন, মিউজিয়মে লিফটম্যান থেকে শুরু করে সিনিয়র টেকনিকাল অফিসারদের অনেকেই এই র‍্যাকেটে সামিল। তাঁদের মধ্যে কারও না কারও ছবিটার দিকে নিশ্চয়ই নজর পড়েছে! বিশেষ করে এই ছবিটার বাজার দরও যেখানে কোটি টাকার কাছাকাছি, ওটা অসম্ভব কিছু নয়।

সুশোভনদা লিখেছেন, জামিল ফেরদৌসের বাকি দু'টো ছবির হদিশ পাওয়া গেলে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করা সম্ভব হবে। সত্যিই কি তাই? এই প্রশ্নটাই বেশি করে জয়দেবের মাথায় ঘুরতে লাগল। ওই দু'টো ছবিতে কী এমন ক্লু থাকতে পারে? ছবি দু'টো কি এখনও বৃন্দাবনেই আছে? সুশোভনদা লিখেছেন, নরহরি মহাপাত্র জানেন, ছবিগুলো কোথায় আছে। তা হলে উনি নরহরি মহাপাত্রের কাছেই গিয়েছেন। অর্থাৎ কিনা ভুবনেশ্বরে। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর প্রায় একশো বছর, ওড়িশায় তাঁর সম্পর্কে কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এত আতঙ্কিত হয়েছিল যে, ওড়িশার সর্বত্র হরিনামসংকীর্তনও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চার বছর ধরে গবেষণা



করছে বলে, জয়দেব আন্দাজ করতে পারল, জামিল ফেরদৌসের আঁকা শেষ ছবি দু'টো ওড়িশারই কোথাও লুকনো আছে। যদি ওইসময় বৃন্দাবন থেকে সরাসরি পাচার হয়ে নবদ্বীপে চলে আসে, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। নরহরি মহাপাত্রের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সেটা সুশোভনদা আবার পছন্দ করবেন কি না, কে জানে?

সঙ্গে সঙ্গে জয়দেব কম্পিউটার খুলে নেট সার্চ করতে বসল। উইকিপিডিয়ায় নরহরি মহাপাত্র নামটা টাইপ করতেই পর্দায় তাঁর সম্পর্কে তথ্যগুলো ফুটে উঠল। মাত্র পাঁচ-ছ'টা লাইন। যে তথ্যটা উল্লেখ্য, সেটা হল ভদ্রলোকের বয়স এখন পঁচাত্তর বছর। উনি খোদ ভুবনেশ্বরে থাকেন না। ভুবনেশ্বর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে খণ্ডগিরি বলে একটা জায়গায় থাকেন। তবে ওড়িশা সাহিত্য অ্যাকাডেমির সঙ্গে ভদ্রলোকের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। জয়দেব ঠিক করে নিল, দুপুরে দোকানে গিয়ে ভুবনেশ্বরে ওড়িশা সাহিত্য অ্যাকাডেমিতে ফোন করে নরহরি মহাপাত্রের বাড়ির ফোন নাম্বারটা চেয়ে নেবে। গবেষণার কাজ করতে গিয়ে লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। উনি নিশ্চয়ই নাম্বারটা দিতে পারবেন! চিঠি ও লেখার জেরক্স কপি ফাইলবন্দি করে জয়দেব উঠে পড়ল।

টিভিটা বন্ধ করার সময় পর্দায় চোখ পড়তেই ও দেখল, কলকাতার কোথাও আগুন লেগেছে। সেই ছবি টিভিতে দেখানো হচ্ছে। গলগল করে ধোঁয়া বেরচ্ছে। পর্দার তলার দিকে হঠাৎ ওর চোখ গেল। ব্রেকিং নিউজ, কলেজ স্ট্রিটের এক প্রকাশনা সংস্থার দপ্তরে আগুন। দমকলের দু'টো ইঞ্জিন আগুন নেভানোর চেষ্টায়। পুলিশের ধারণা, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন। লাইনগুলো ডানদিক থেকে বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে। জায়গাটা খুব চেনা চেনা লাগল জয়দেবের। কলেজ স্ট্রিট দেখেই ওর কৌতূহল হল। বইপাড়া ওর হাতের তালুর মতো চেনা। টিভির সাউন্ড বাড়িয়ে দিতেই নিউজ রিডারের গলা পেল ও, 'মঙ্গলবার গভীর রাতে কলেজ স্ট্রিটের সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের এক প্রকাশনা সংস্থার দপ্তরে হঠাৎ আগুন লাগে। দোকানের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখে, বাড়ির মালিক দমকলে খবর দেন। সঙ্গে সঙ্গে দমকলের দু'টো ইঞ্জিন চলে আসে। তিন ঘণ্টার চেষ্টার পর দমকল কর্মীরা আগুন আয়ত্তের মধ্যে আনেন। দোকানের আশি শতাংশ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। পুলিশের অনুমান, রাতে বৃষ্টি হওয়ার পর সম্ভবত দোকানে ইলেকট্রিক তারে শর্ট সার্কিট হয়। তাতেই আগুন লাগে। বাড়ির মালিক অংশুমান গুপ্ত সপরিবারে দোতলায় থাকেন। তিনি জানান, রাত একটা নাগাদ ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন...।'

পর্দায় অংশুমানবাবুর মুখটা ভেসে উঠল। তিনি কী বলছেন, জয়দেব শুনতে পেল না। ধপ করে ও সোফায় বসে পড়ল। শর্ট সার্কিটের জন্য ওর দোকানে আগুন! কী করে সম্ভব? এই মাস তিনেক আগে নতুন করে ও দোকানে ইলেকট্রিকের তার লাগিয়েছে। সেই তারে শর্ট সার্কিট হবে কী করে? চিন্তা করার শক্তিটাও জয়দেব হারিয়ে ফেলল। টিভির খবরে বলল, দোকানে আগুন লেগেছে, রাত একটায়। এখন সকাল ন'টা বাজে। মাঝে আটটা ঘণ্টা কেটে গেল, টিভির লোকেরা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। আর এই ভয়ানক দুঃসংবাদটা ওকে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না অংশুমানবাবু? উনি বাড়ির ফোন নাম্বার জানেন, এমনকী মোবাইল নাম্বারটাও। তা হলে? জয়দেব নিশ্চিত, আগুনটা শর্ট সার্কিট থেকে লাগেনি। এর পিছনে কি অন্য কোনও কারণ আছে? সুশোভনদার পিছনে লেগে থাকা দুষ্টচক্রই কি ওকে ভয় দেখাল?

নাহ্, এখনই একবার কলেজ স্ট্রিট যাওয়া দরকার। জয়দেব উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই, ওর ল্যান্ডলাইনের ফোনটা বাজতে শুরু করল।

পরের এপিসোড আগামী রোববার

অলংকরণ শান্তনু দে

প্রাচীনার নবীনবেলার কাহন

চিত্রলেখা চৌধুরী

বাবার এক দূরসম্পর্কের দিদি ছিল—আমার পিসি। বাবার কোন এক পিসতুতো বোন। তাদের বাড়ির আর কারওর সঙ্গে আমাদের তেমন যোগাযোগ-যাতায়াত ছিল না। কেবল এই পিসিই নিয়মিত বাড়িতে আসত। তাই বাড়ির একজন হয়ে গিয়েছিল।

আমার এই পিসির একটা অদ্ভুত নাম ছিল। ছিল না, হয়ে গিয়েছিল—গান্ধীপিসি। পিসির মাথায় খুব অল্পবয়সে চুল উঠে টাক পড়ে গিয়েছিল। চকচকে মাথার চাঁদিটি। পিসি একটা টুপি পরতেন—গান্ধী টুপি। সেই থেকেই বোধহয় নাম হয়েছিল গান্ধীপিসি।

পিসির গায়ে সবসময় নার্সদের মতো কনুইহাতা ব্লাউজ। কোমর অবধি ঝুল। আর পরনে মাড় দেওয়া সাদা শাড়ি—কখনও গায়ে নীল, কখনও সবুজ চওড়া ঢালা পাড়। শাড়ির আঁচল কুঁচি দিয়ে কাঁধের কাছে পিন করা। পায়ে কেডস। সেই অবস্থায় চড়া রোদে কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে বেড়াত গান্ধীপিসি।

গান্ধীপিসি স্বদেশি করত কি না জানি না। করলেও দু-একটা সভাসমিতিতে যাওয়ার বেশি কিছু করত বলে আমার মনে হয় না।

বেলা-অবেলায় মাঝে মাঝে হুটহাট এসে উপস্থিত হত বাড়িতে।

ঠাকুমা চেঁচিয়ে বলত,

—বকুল এসেছে। ওকে খেতে দে।

আর মা, দুপুরের ঘুমটাকে বালিশের কাছে গচ্ছিত রেখে, গজগজ করে রওনা দিত রান্নাঘরের দিকে। ওই গজগজটুকুই সার। কোনওদিন স্পষ্ট করে গান্ধীপিসির মুখের ওপর কোনও কড়া কথা বলতে শুনিনি মাকে বা জেঠিমাকে। নিচু গলায় বলত,

—ঠাকুরঝি, তুমি একটু আগে খবর দিয়ে আসতে পারো না?

গান্ধীপিসিমা আরও নিচু গলায় বলত,

—কিছু করতে হবে না তোমাদের বউদি। মুড়ি নেই বাড়িতে? একটু মুড়ি মেখে দাও না।

জেঠিমার চোখ কপালে,

—ওমা! দুপুরবেলা মুড়িমাখা খাবে কী?

পিসিমার ঠোঁটে শুকনো হাসি,

—তাই তো খাই অর্ধেক দিন। রাস্তাঘাটে কে আর আমার জন্য রেঁধে রাখছে, বলো?

গান্ধীপিসিমার বিয়ের কোনও চেষ্টা হয়নি। টেকো মেয়েকে আবার কে বিয়ে করবে? আর এমনিতেও বাবার পিসেমশাই, মানে গান্ধীপিসিমার বাবা মারা গিয়েছিলেন পিসিমার ছোটবেলায়। ফলে মেয়ের মাথায় টাক পড়ে একদিক দিয়ে যেন বেঁচেই গেল গোটা পরিবার। কাউকে আর আলাদা করে দায়িত্ব নিয়ে টেকো মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ করতে হল না।

আমার ধারণা গান্ধীপিসিমা সারা জীবনের আইবুড়ো বদনামটুকু আড়াল করার জন্যই, মাড় দেওয়া শাড়ি, নার্সের ব্লাউজ আর গান্ধী টুপিখানা বেছে নিয়েছিল। স্বতন্ত্রকে যেন সাধারণের বদনামের তোয়াক্কা না করলেও চলে!

গান্ধীপিসিমার পড়াশোনা ছিল খুব। তখনকার দিনের গ্র্যাজুয়েট। বিএ পাশ করার পরও নিজের মনে পড়াশোনা করতেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।



বাড়ি ফিরে গল্প বলতেন,

—এত লোক ন্যাশনাল লাইব্রেরি যায় কেন বলত?

—কেন পিসি?

—বাড়িতে পাখা নেই, ওখানে পাখার তলায় দুপুরটা কাটাবে বলে।

গান্ধীপিসিমার কাছেই প্রথম শুনি টাঙাইল বা ধনেখালি কেবলমাত্র শাড়ির নামই নয়—জায়গার নামও বটে। ঠিক যেমন ফরাসি দেশের শিফন বা শ্যাম্পেন জায়গার নামেই নাম পেয়েছে। সারা পৃথিবীর খবর দেওয়ার তখন আমাদের একটাই মানুষ।

এমনি চুপচাপ সদালাপী মানুষ গান্ধীপিসিমা, কারওর ওপর রাগ করতে দেখিনি। তবু মাঝে মাঝে আমরা ভাইবোনেরা যখন একসঙ্গে সমস্বরে ছড়া কাটতাম, 'গান্ধীর বগলে টকটক গন্ধ'—আর অমনি শান্তশিষ্ট মানুষটা কেমন খাপ্পা হয়ে উঠত।

গান্ধীজির বড় ভক্ত ছিলেন পিসিমা। বারবার আমাদের বলত—আর একটু বড় হ। 'মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ'-টা পড়ে শোনাব তোদের। তারপর একদিন বিকেলে গান্ধীজির মারা যাওয়ার খবর এল। আমাদের বাড়ির পিছনের চালাঘরে যে হিন্দুস্থানি পরিবারটা থাকত, তাদের ছেলেটা এসে আমাদের ডেকে নিয়ে বলল,

—শুন্ শুন্ গান্ধী ফট।

আর হাত দিয়ে টয় পিস্তল ফাটানোর ভঙ্গি করল।

সেকি হাপুস নয়নে কান্না গান্ধীপিসিমার! সারা সন্ধে কাঁদল, রাত্তিরে কিছু খেল না।

ঠাকুমা একসময় রেগে বলল,

—এমন করছে, যেন বেধবা হয়েছে। সত্যিই বোধহয় মনে মনে বিধবা হয়েছিল গান্ধীপিসিমা।

একটা বিদেশে পড়া ব্যারিস্টার মানুষ কোটপ্যান্ট ছেড়ে কৌপীন-চাদর ধরে, অমন একটা বিস্ফোরক আত্মজীবনী লিখে কোথায় যেন আমার কেশহীনা পিসিমার আত্মার সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। মধ্যবিত্তকে অতিক্রম করার সাহস দিয়ে, শুভ্রতার প্রতিমূর্তি করে দিয়েছিল সংসারে ব্রাত্য এক আজীবনের আইবুড়োকে। সেই গান্ধীজির বেঁচে থাকাই যেন পিসিমার অবলম্বনের, একান্ত প্রিয় সান্নিধ্যের জীবন। মৃত্যু দিয়ে সেটা শূন্য করে দিলেন গান্ধীজি।

গান্ধীপিসিমা তারপর বেশ কিছু বছর বেঁচেছিল। মারা যখন গেল, তখন বাড়িতে তুমুল আলোচনা—কেমন করে দাহ করা হবে? টুপিসুদ্ধ না টুপি ছাড়া?

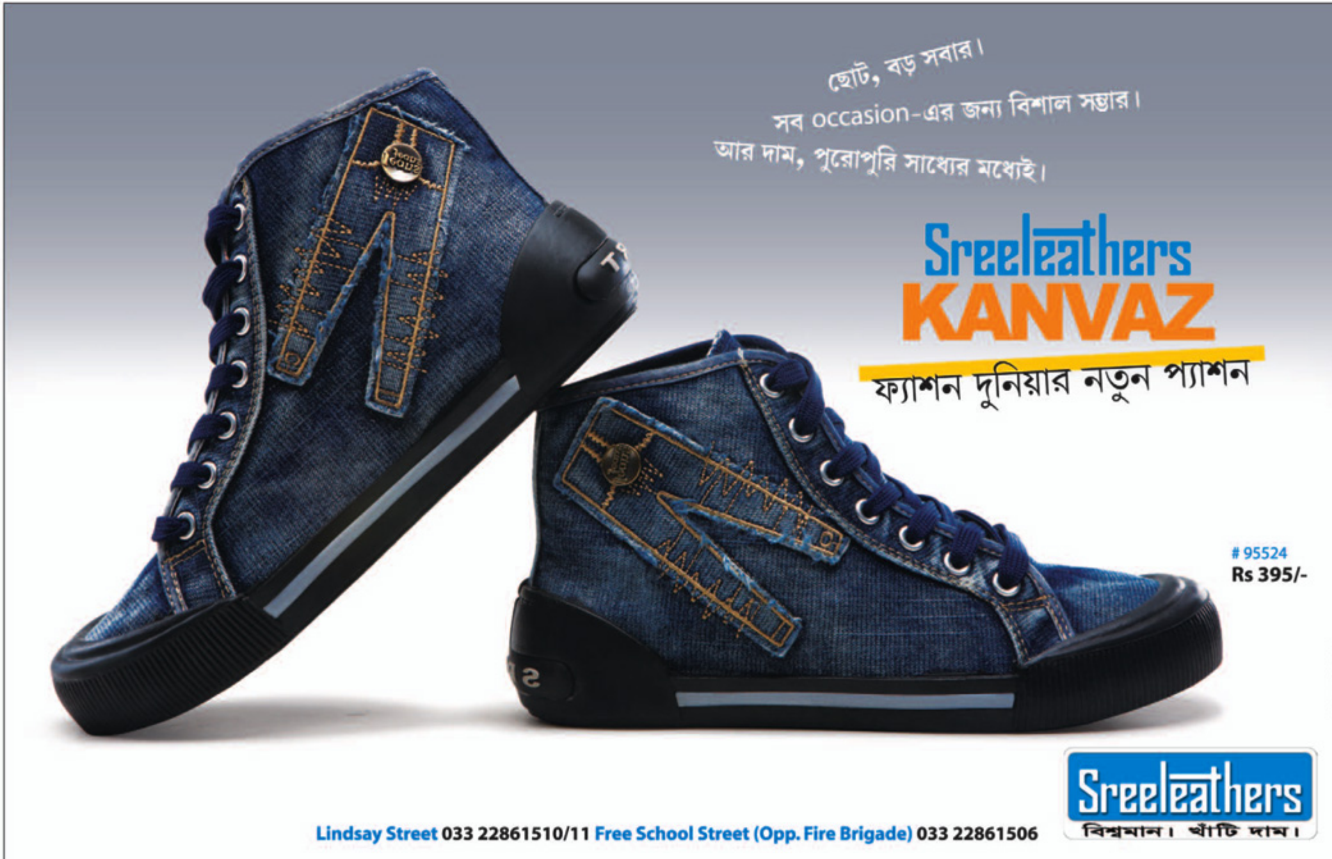
শেষ পর্যন্ত শ্মশানের ডোমের নির্দেশে গায়ের সব কাপড়টুকু যখন সরিয়ে নিয়ে চাদর ঢেকে দেওয়া হল—তখন কোথায় পড়ে রইল গান্ধী টুপিটা, কে জানে?

একদিক দিয়ে বোধহয় গোটা পরিবার হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল—একটা আইবুড়ো বিধবাকে সারা জীবন পোষবার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। আর আমার মনের ভেতর পোক্ত হয়ে গেল একটা ধারণা।

শ্মশান যে ডাকাতদের আড্ডা, তা গল্পের বইয়ে পড়েছিলুম। এবার জানলুম যাদের নিয়ে গল্প লেখা হয়, তারা ছাড়াও আরও অনেক ডাকাত আছে শ্মশানে।

তাদের দেখা যায় না।

কিন্তু তারাই আসলে কখন সবার অজান্তে চুরি করে নেয় পিসিমার গান্ধী টুপি, ঠাকুমার নাকছাবি।


ছোট, বড় সবার।
সব occasion-এর জন্য বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
95524
Rs 395/-
Genesis 2877
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street 033 22861510/11 Free School Street (Opp. Fire Brigade) 033 22861506



ব্র্যান্ডবাদশার নামরহস্য

একটা আপেল। তাতে একটাই কামড়। আমদুনিয়ার, এ শ্রেষ্ঠ স্টেটাস-সিম্বল। জেনারেশন এক্স-এর নয়া কেত। অ্যাপ্‌ল। পৃথিবীর সবচেয়ে নামী-দামি ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার-সফটওয়্যার কোম্পানি। এই মুহূর্তে ন'টা দেশে তাদের আড়াইশোরও বেশি চালু দোকান। ১৯৭৬ সালের ১এপ্রিল এর পত্তন হয় দক্ষিণ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়। তৈরি করেন স্টিভ জবস্‌, স্টিভ ওজনিয়াক এবং রোনাল্ড ওয়েন। রোনাল্ড নিজেই তৈরি করলেন প্রথম লোগো। স্যর আইজ্যাক নিউটনকে আপেল গাছের নীচে বসে থাকতে দেখা যায় এতে। লোগো কারওরই খুব একটা পছন্দ হল না। ১৯৭৭ সালে, আর্ট এবং গ্রাফিক ডিজাইনার রব জ্যাঁফকে লোগো তৈরির বরাত দেওয়া হল। তিনি বানালেন ছিমছাম, দৃষ্টিনন্দন লোগো—একটা আপেল। যাতে একবার কামড় দেওয়া হয়েছে। যার গা-ভর্তি রামধনুর সাতটি রং, কিন্তু পরপর নয়। রঙের এই ভুল ক্রম আসলে প্রচলিত মিথকে চুরমার করে দেওয়ার ঘোষণা জানায়। উন্মাদনা ও এনার্জির রূপক এই রংগুলো। নানান গপ্পো-গুজব এই লোগোটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আপেলের হারানো অংশটি নাকি আসলে মানুষের জ্ঞান-পিপাসার প্রতীক। আপেল তো বাইবেল অনুযায়ী, জ্ঞানবৃক্ষের ফল। আবার একটু লক্ষ করলে এই লোগোতে এক চমৎকার শব্দের খেলাও চোখে পড়ে। ইংরেজি শব্দ 'বাইট'(Bite) মানে 'কামড় বা 'দংশন'। ওদিকে কম্পিউটার তথ্য রাখা হয় বাইনারি ডিজিটকে ব্যবহার করে। এদের বলে 'বিটস'। আটটি বিটসকে বলা হয় বাইট (Byte)। লোগোতে এই দু'টি বিষয়কে মেলানো হয়েছে অসামান্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। লেখিকা স্যাডি প্ল্যান্টের মত অবশ্য ভিন্ন। তাঁর 'জিরোস্ অ্যান্ড ওয়ানস্' বইতে তিনি অ্যালান টার্নিং-এর কথা বলেছেন। আধুনিক কম্পিউটারবিদ্যার জনক অ্যালান আপেলে সায়ানাইড ইঞ্জেকশন দেন ও সেটি কামড়ে খেয়ে আত্মহত্যা করেন। স্যাডি অনুমান করেছেন কোম্পানির কতৃপক্ষ টার্নিং-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত এক-কামড় দেওয়া আপেলটিকে তাঁদের লোগো হিসেবে বেছে নেন। 'ম্যাকিনটস' শব্দটির মানে হল এক বিশেষ প্রজাতির আপেল। একটানা কুড়ি বছর এই 'রেনবো আপেল'-এর কদর ছিল। 'পরিবর্তনই জীবনের আসল সত্যি'—এই মতে বিশ্বাসী স্টিভ, ১৯৯৭ সালে রঙিন আপেলটিকে 'সলিড' রঙে রাঙানোর কথা ভাবতে শুরু করেন। শেষ কয়েক বছরে নানা রঙের আপেলকে লোগো হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয় 'অ্যাকোয়া কালার স্কিম।' চড়া রঙের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এখন সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে রুপোলি রঙা আপেল। এ আপেল আরও তন্বী। আর পাঁচটা নিষিদ্ধ বস্তুর মতোই আকর্ষণীয়। গোপন ইশারা করে আই-ম্যাকের ওপরে, পাওয়ার ম্যাক জি.৩ টাওয়ারের পাশে কিংবা আইফোনের পৃষ্ঠদেশে বসে।

অদিতি বসুরায়



taste elegance
Music CDs
Experience Seagram's Blenders Pride Magical Nights events.
O&M 112
SEAGRAM'S
BLENDERS
PRIDE
MAGICAL NIGHTS
the new look Blenders Pride